কৰ্ম্মক্ষেত্র

শ্রীশশিভূষণ সেন-প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

সিটী বুক সোসাইটী,

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্।

১৩১৭

প্রকাশক—শ্রীকেশব চন্দ্র চৌধুরী।

 [মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা

KARMA KSHETRA

OR THE

Sphere of Action.

BY

SASIBHUSHAN SEN,

Author of Hitakatha &c.

Third Edition

Calcutta.

THE CITY BOOK SOCIETY.

64, COLLEGE STREET.

PUBLISHED BY

KESHAB CHANDRA CHOWDHURY.

1910.

[Price 1-4-0.

A

BRIEF SKETCH OF THE CONTENTS AND SCOPE

OF

KARMAKSHETRA.

BY

SASI BHUSHAN SEN.

THE title of the book is KARMAKSHETRA OR THE SPHERE OF ACTION. It is divided into four parts.

(I) "Saktiparichaya" or a consciousness of and firm belief in the existence of **"Will force"** in man.

(II) "Sankalpa" or a noble determination to start with.

(III "Sádhaná" or a steady application and a persevering energy in the sphere of action.

(IV) "Siddhi" or success –the attainment of which may not happen in one's life time but is sure to come sooner or later. All these chapters have been illustrated by lives of some Indian celebrities--Hindu, Mahomedan, Christian and Parsi.

2. The first thing that has been tried, is to convince the reader that "Volere é Potere" *i.e.* **"Will is power."** "For although men are accused of not knowing their weakness yet perhaps as few know their own strength. It is in men, as in soils, where some times there is a vein of gold which the owner knows not of." The first thing that a young man should be taught is that he should know of and believe in his **"Power within"** otherwise all his efforts to improve himself Physically, Intellectually and Morally might be spasmodic. To

make the theme of "**Will force**" lucid and convincing, the author has illustrated it by incidents from the lives of GOUTAM BUDDHA, RANA PRATAP SING, CHANAKYA and others. This may be said to be the introduction to the book.

3. In Parts II to IV illustrations have been drawn from the lives of the following Indian celebrities, all of whom were more or less in touch with and honoured and benefitted by the British Raj. (1) RAJA RAM MOHAN ROY : about him Professor Max Muller very truly said : "The German name for Prince is Furst ; in English, First,—He who is always in the fore, he who counts the place of danger, the first place in fight, the last in flight. Such a Furst was RAM MOHAN ROY a true prince—a real Raja, if Raja also, like Rex, meant originally the steersman, the man at the helm." (2) MAHARAJA SIR RAM BARMA G.C.S.I. His Highness was noted for his scholarship. His love for the experimental sciences was genuine and he continued his studies of astronomy, experimental physics and chemistry vigorously throughout his life. He instituted a new chair in the Trivendrum College for teaching chemistry and physics. (3) SIR T. MADHAV RAO and (4) SIR S. ALAR JANG, both of whom represented the highest type of Statesmanship. (5) PANDIT ISWAR CHANDRA VIDYASAGAR the greatest Bengali Philanthropist and educationist. (6) TARANATH TARKAVACHASPATI the great Sanskrit lexicographer and founder of the Free Sanskrit College in Calcutta.

which is now managed by his son, Pandit Jivananda Vidyasagar. (7) SIR SYED AHMED of Aligarh, a self-made man and whose labours for the education of his co religionists in India are well known. (8) SIR T. MATHUSWAMI IYER. He began life on Rupee one per month but afterwards rose to be a Judge of the Madras High Court. (9) SYAMA CHARAN SARKAR. a great Scholar and an eminent Jurist and who rose to be the Chief Interpreter of the Calcutta High Court and was also the Tagore Law Professor in 1872. He like every self-made man had to pass through the apprenticeship of difficulty. At the age of 21 years he began to learn the rudiments of the English language. (10) MICHEL MADHUSUDAN DUTT was a renowned linguist and a great poet. He introduced Blank Verse in the Bengali literature. He was in fact the greatest literary genius of his time. (11) AKSHAYA KUMAR DUTT, a great Bengali writer who helped in perfecting the literary prose style of Bengal. (12) RAM DULAL SARKAR was originally a charity boy but rose to be the Prince of Bengali merchants of his time in Calcutta. (13) SIR JAMSETJI-JI-JI-BHOY. He went to China in his sixteenth year carrying with him his whole fortune amounting to about Rs. 120 but afterwards became the first baronet of that name.

4. To the rising generation of India, the lives of these Indian celebrities are full of practical lessons. Their careers set them bright and noble examples which they might follow with advantage. All these men, as

has been said before, were more or less in touch with and honoured and benifitted by the British Government. It has been the author's endeavour in these pages to convince the readers that there is an ample field under the benign BRITISH RAJ for young aspirants to rise. He has avoided what is called the art of directly preaching the rights and privileges of a British subject, for the best of the art lies in concealing the art. If the readers are thoughtful and if the book is properly explained, it is expected the book will do immense good to the rising generation of Indian youths of all ranks and religions. They will unconsciously learn to admire and be drawn to the ideals and imitate them and thus become loyal and worthy citizens of an Empire vaster and nobler than the Roman.

নিবেদন।

আমাদের স্বদেশীয় যুবকগণের মঙ্গলকামনায় কর্ম্মক্ষেত্র রচিত ও প্রকাশিত হইল। ইহাতে কর্ম্মবাদের জটিল দার্শনিক কোন কথার আলোচনা করা হয় নাই। এ গ্রন্থের সে উদ্দেশ্য নহে। মানবের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি নামক ঈশ্বরপ্রদত্ত এক মহাশক্তি বিদ্যমান আছে; এই কথাটী বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের প্রথমে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্ব কর্ম্মের পূর্ব্বে আত্মশক্তি অবগত হওয়া আবশ্যক। মানব বিশ্বাসের দাস। মানুষ যদি সরল ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাহার ইচ্ছাশক্তি আছে, আর সেই মহাশক্তির সাহায্যে সে নানা কঠোর ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিতে পারে, তবে সে কেন বিঘ্ন বাধায় প্রতিহত হইয়া অদৃষ্টের দোষ দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে? মানবের ইচ্ছাশক্তিতে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে। উপদেশ ও আদর্শের দ্বারা তাহাকে উদ্দীপিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কর্ম্মের মূলে সঙ্কল্প, মধ্যে সাধনা এবং শেষে সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। স্বদেশের কর্ম্মবীরগণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে, আশা, অধ্যবসায়, সাহস, নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সাধনা করিলে, আমাদের যুবকগণ অনুরূপ সিদ্ধিলাভ করিবেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে বরণীয় হইবেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরগণের ধারাবাহিক জীবনী দেওয়া হয় নাই। ইহা জীবনী সংগ্রহ নহে। যে সকল মহাত্মার আদর্শ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই বিস্তৃত জীবনী আছে।

সুদক্ষ চরিতাখ্যায়কগণ তাঁহাদের জীবনের সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন সুতরাং সংক্ষেপে সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। এই গ্রন্থ রচনাকালে এই সকল গ্রন্থকারের সংগৃহীত জীবনী হইতে অনেক সাহায্য লওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য এস্থলে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

এই গ্রন্থে কর্ম্মের তিনটী অবস্থা দেখান হইয়াছে। প্রথম সঙ্কল্প, দ্বিতীয় সাধনা এবং তৃতীয় সিদ্ধি। যে সকল কর্ম্মবীরের আদর্শ এখানে সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা ভারতের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তাঁহাদের বিশেষ পরিচয়, জন্মমৃত্যুর কাল, জন্মস্থান বা পিতৃমাতৃকুলের বিবরণ এখানে দেওয়া হয় নাই। সে সকল কথা তাঁহাদের জীবনী-গ্রন্থে আছে। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মসমূহের সঙ্কল্প কিরূপ অবস্থার মধ্যে করা হইয়াছিল, কি প্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সে গুলির সাধনা হইয়াছিল, এবং শেষে সে গুলি সিদ্ধ হইয়াছিল কি না, কর্ম্মক্ষেত্রে এই সকল কথা প্রধানতঃ বলা হইয়াছে। আশা করা যায়, স্বদেশীয় যুবকগণ কার্য কালে কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে এই সকল পুণ্যপ্রসঙ্গ পাঠে সৎকর্ম্মের জন্য কৃতসংকল্প হইবেন, আশা, অধ্যবসায়, সাহস, নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সাধনায় রত থাকিবেন এবং শেষে ভগবানের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করিবেন। ইতি

আরা,
চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩০৯ সাল।

গ্রন্থকারদ্বয়

দ্বিতীয় সংস্করণের

নিবেদন।

মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কর্ম্মক্ষেত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ভারতীয় যুবকগণের সময়োপযোগী বিশেষ পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, এবং পূজ্যপাদ রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর তাঁহাদের সঙ্কলিত [illegible] সালের বাঙ্গালা এণ্ট্রান্স কোর্সে এই পুস্তকের 'শক্তি-পরিচয়' এবং 'সঙ্কল্প' নামক প্রথম দুই অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক উহা অনুমোদিত হইয়াছে। ইহাতে আমি আহ্লাদিত ও সম্মানিত হইয়াছি এবং এই উপলক্ষে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধীমণ্ডলীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বোম্বাই নগরের এস্‌প্লেনেড হাইস্কুলের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নাগজী মোহনজী শাস্ত্রী ব্যাস বি, এ, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হয়েন এবং আমার অনুমতি লইয়া তদ্দেশীয় যুবকগণের কল্যাণকামনায় গুজরাটি ভষায় কর্ম্মক্ষেত্রের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সম্মান দেখিয়া আশা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে সিদ্ধিদাতা ভগবানকে বার বার নমস্কার করিয়া অদ্য তাঁহার জয় উচ্চারণ করিতেছি।

প্রথম সংস্করণে পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষাগত যে সামান্য সামান্য ত্রুটী পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এই সংস্করণে সে গুলির সংশোধন করিতে

চেষ্টা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আর্য্যমিশন ইন্‌ষ্টিটিউসনের সুযোগ্য সংস্কৃতাধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় আমাকে বিশেষ সাহার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

আরা
আশ্বিন ১৩১৫

বিনীত
শ্রীশশিভূষণ সেন।

"জাগো, উঠো, চল সুখে,

কিসের ভাবনা ?

কর্ম্ম জীবনের যন্ত্র,

কর্ম্ম সাধনার মন্ত্র,

কর্ম্ম বেদ, কর্ম্ম তন্ত্র,

পুণ্যতীর্থ কর্ম্মক্ষেত্র,

এ মহা সাধনক্ষেত্রে

পরাণ সঁপনা।

"Work is the mission of man on this Earth. A day is ever struggling forward, a day will arrive in some approximate degree, when he who has no work to do, by whatever name he may be named, will not find it good to show himself in our quarter of the Solar System, but may go and look out elsewhere if there be any idle planet discoverable"—Carlyle.

সূচীপত্র

শক্তি-পরিচয়।
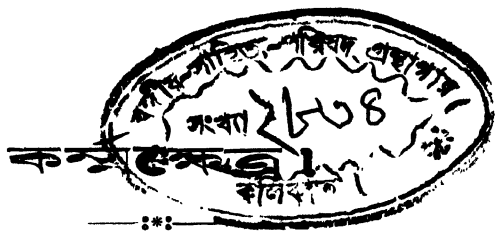
মানব সদা কর্ম্মশীল। নিষ্ক্রিয় মানবের অস্তিত্ব কষ্টকল্পনার বিষয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক, আর অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, মানবের অন্তরে বাহিরে নিরন্তর কোন না কোন কার্য্য হইতেছে। ধমনীতে রক্তসঞ্চালন, ফুস্‌ফুসে শ্বাসক্রিয়া, মস্তিষ্কে চিন্তনকার্য্য হইতে, ভোজন, ভ্রমণ, ভূমিকর্ষণ, গৃহনির্ম্মাণ, লৌহবর্ত্ম-বিস্তার, সেতুবন্ধন, সমুদ্রে তাড়িত বার্ত্তাবহ তার বিস্তার, আকাশে ব্যোম-যানাদিতে গমনরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ অদৃশ্য বা দৃশ্য কোন না কোন কর্ম্মে মানব নিয়ত ব্যাপৃত আছে। এই সকল কার্য্যকে আমরা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ইহাদের কতকগুলি স্বতঃ হইতেছে, এগুলি মানবের ইচ্ছার অধীন নহে, যেমন রক্তসঞ্চালন, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, দেহের বৃদ্ধি প্রভৃতি। অপরগুলি মানবের ইচ্ছা অনুসারে হইতেছে, সেগুলি মানবের ইচ্ছাসাপেক্ষ। যে সকল কার্য্য মানবের ইচ্ছার অধীন নহে, সেগুলি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। যে সকল কার্য্য মানবেচ্ছার অধীন বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, সেইগুলিই আমাদের আলোচ্য। এই সকল কার্য্য, সূচনা হইতে সিদ্ধি পর্য্যন্ত, কি পরিমাণে ইচ্ছাশক্তিসাপেক্ষ তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কর্ম্মের সহিত ইচ্ছাশক্তির সম্বন্ধ বুঝা আবশ্যক, নহিলে আত্মশক্তির অজ্ঞতাজনিত বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। নিজের দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা যেমন মানুষের জানা উচিত, তেমনই

কোথায় তাহার শক্তি, তাহাও জানা আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, দরিদ্র ভূস্বামী নিজ অধিকৃত ভূমিতে গুপ্তধনের অস্তিত্বের বিষয় অবগত না থাকায়, দুঃখে দারিদ্র্যে দিন যাপন করে। সেইরূপ অনেকে নিজের শক্তি কত, তাহা না জানায়, সংসারের সামান্য বিঘ্নবাধায় অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে, উৎসাহিত করিবার পূর্ব্বে, ইহাদিগকে ইহাদের আত্মশক্তির কথা বুঝাইয়া দিলে অধিক উপকার হয়। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় ভাবের উদয় হইতে পারে, ভাবের বলে কর্ম্মে পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে; কিন্তু সে প্রবৃত্তি মূর্চ্ছারোগগ্রস্থ ব্যক্তির হস্তপদসঞ্চালনের ন্যায় ক্ষণ-স্থায়িনী হয়। প্রয়াস স্থায়ী করিতে হইলে, যুক্তিমূলক বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে। মানব বিশ্বাসের দাস।

কর্ম্মে মনুষ্যের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর এই কর্ম্মের মূলে তাহার ইচ্ছার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। ইচ্ছা দ্বারা কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা হয়। ইচ্ছাই শক্তি। এই শক্তি যাহার মধ্যে যত বেশী, সে, সেই পরিমাণে কৃতী। মানবের দেহ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, যন্ত্রস্বরূপ; মন যন্ত্রী হইয়া ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহাদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ করি-তেছে। দেহের উপর ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য আশ্চর্য্যজনক। দেহ অব-সন্ন হইয়া পড়িয়াছে, স্থাণুবৎ নিষ্পন্দ হইয়াছে, তথাপি মনের নির্দ্দেশে, ইচ্ছাশক্তির প্রবর্ত্তনায়, সে কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট। পৃথিবীর কর্ম্মবীরগণের জীবনী আলোচনা করিলে, এ কথার যাথার্থ্য সবিশেষ উপলব্ধি করা যায়।

পৃথিবীর সেই মহাপুরুষ সিদ্ধার্থের সাধনার কথা লইয়া আমরা এই কথা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। সিদ্ধার্থ আড়ারকালাম ও রুদ্রক নামক দুই প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট হিন্দুশাস্ত্র ও যোগশিক্ষা-সমাপন করিলেন। তাঁহারা সিদ্ধার্থকে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে পারিলেন না। সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন,— দেহকে পাপ হইতে

দূরে রাখিলাম তাহাতে কি? দেহ ও মনে এখনও যে বাসনার বেদনা অনুভব করি—বাসনা নির্ম্মূল না করিলে হইল কি? কৃচ্ছ্র সাধনে দেহমন ক্ষয় করিব—বাসনার বীজ দেহমন হইতে উৎপাটিত করিব, তবে নিশ্চিন্ত হইব। এই সঙ্কল্প করিয়া সিদ্ধার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নৈরঞ্জনার তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে ক্রমে উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি শালবন আছে। সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। বনস্থলী শান্তিরসে পূর্ণ। নৈরঞ্জনা সেই রম্য বনস্থলীকে সতত স্নিগ্ধ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ছায়াপ্রধান বৃক্ষ সকল ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। উর্দ্ধে বৃক্ষশাখায় কলকণ্ঠ বিহগগণের কাকলী, নিম্নে হংস-কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণের কলরব স্থানটিকে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতি মূর্ত্তিমতী শান্তি রূপে সেখানে চিরবিরাজ করিতেছেন। সিদ্ধার্থ পূর্ব্বে প্রমোদকাননে কত বিচরণ করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে এ শান্তি—এ তৃপ্তি পান নাই। এ স্থানে আসিয়া প্রাণ যেন শান্তিরসে আপ্লুত হইল। তিনি ইহাকে সাধনার উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া, কৃত-সঙ্কল্প হইয়া, সেই রম্য বনস্থলীর মধ্যে যোগাসনে বসিলেন। সিদ্ধার্থ ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে যোগ প্রক্রিয়া দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলেন—যোগাসনে স্থিরতর হইয়া বসিলেন। এই যোগাসনে ক্রমাগত ছয় বৎসর অচল অটলভাবে কাটাইলেন। অন্তরে বাহিরে কত সংগ্রাম হইতে লাগিল। ক্ষুৎপিপাসা, স্নেহমমতা কিছুই তাঁহাকে কাতর করিতে পারিল না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তুষার-মণ্ডিত উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে ধ্যানে মগ্ন। দেহের উপর দিয়া বৈশাখের রৌদ্র, শ্রাবণের ধারা, মাঘের হিম সকলই চলিয়া যাইতেছে। স্থিরপ্রতিজ্ঞ সাধকশ্রেষ্ঠের সেদিকে দৃষ্টি নাই। এই সুদীর্ঘ ষড়্‌বর্ষ, সিদ্ধার্থ কোন দিন একটি বদরী,

কোন দিন তিলতণ্ডুল ভোজন করিয়া, কোন দিন বা অনশনে অতি-বাহিত করিয়াছেন। শাক্যকুলের গৌরব, কপিলবাস্তুর অলঙ্কার, রাজকুমার সিদ্ধার্থের সে কমনীয় দেহ আজ কঙ্কালসার হইয়াছে,— স্থাণুবৎ নিস্পন্দ হইয়াছে! এখন জিজ্ঞাসা করি, মানব-দেহের উপর ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য কত? ইচ্ছা প্রবল হইলে এবং সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে, দেহপাত করিয়া, আত্মবলি দিয়া, যাহা সাধ্য, মানুষ তাহা করিতে পারে, এ বিষয়ে অতঃপর কে সন্দেহ করিবে?

ধর্ম্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার যোগতপ সাধন করিবার রীতি অদ্যাপি এদেশে প্রচলিত আছে। যে মুক্তি-লাভের জন্য সিদ্ধার্থ তাদৃশ উৎকট সাধনা করিয়াছিলেন, সেই মুক্তি-কামনায় আজিও কত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি নিবিড় অরণ্যে, নিভৃত গিরিগুহায়, যোগ-নিরত রহিয়াছেন। ইঁহাদের এইরূপ সাধনায় ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানুষ উদ্দেশ্যসিদ্ধিলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে শারীরিক ক্লেশকে বাধা বলিয়া বিবেচনা করে না। দৈহিক অবসাদ, শারীরিক যন্ত্রণা কিছুই ইচ্ছাশক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে না। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী-নিঃসৃত স্রোতঃ যেমন সম্মুখস্থ শিলা সকলকে অতিক্রম করিয়া যায়, সেইরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রবল বাধাকেও অতিক্রম করিতে পারে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ স্নেহমমতা, সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, যে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকারের সাধনা। সে সাধনা সাত্ত্বিক। আর এক প্রকারের সাধনার কথা বলিব। তাহা রাজসিক। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্রের উপাসক একজন সাধকপ্রবরের কাহিনী এখানে উল্লেখ করিব। তাহাতে বুঝিব, প্রনষ্ট গৌরব ও হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, রাজকুমার বনবাসী হইয়া ফলমূল খাইয়া কি কঠোর সাধনা করিতে পারেন। এ সাধনার স্থান রাজপুতানা। প্রকৃতির প্রচণ্ডমূর্ত্তির লীলাস্থল রাজপুতানার

কোথাও বা সুদূর বিস্তৃত মরুভূমি, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিসমূহ, কোথাও বা তন্বী স্রোতস্বিনী এই বিরলপ্রজ প্রদেশের শোভাসম্পাদন করিতেছে। এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে স্বাধীনতার পুণ্যভূমি—সতীধর্ম্মের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান চিতোর অবস্থিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও চিতোর মুসলমানের অধিকৃত। উদয়সিংহ চিতোর হইতে বিতাড়িত হইয়া, উদয়পুরে সামান্য রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু চারি বৎসর গত হইতে না হইতে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। উদয়সিংহের মৃত্যুতে প্রতাপসিংহ মেওয়ারের রাণা হইলেন। মোগল সম্রাট্ তাঁহার পিতৃশত্রু। আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে অনেকে দিল্লীর সম্রাটের পক্ষ। কতকগুলি স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত ভিন্ন জগতে প্রতাপের অন্য কেহ নাই। সহায় সম্বল, বল ভরসা, যাহা কিছু বল—তাঁহারাই। ইঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতাপ মোগল-রাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। এমন কি সখ্য স্থাপনেও ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। প্রতাপের ইচ্ছা চিতোরের উদ্ধার। নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া সুদুস্তর মোগল সৈন্যসাগর পার হইবেন ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা,—ইহাই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি সতত তৎপর। তিনি শত্রুসৈন্যের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইতে লাগিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনাহারে, অনিদ্রায়, মেওয়ারের রাজপুতগণকে রণকুশল করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে প্রতাপসিংহ দ্বাবিংশতি-সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এ দিকে লোক-পরম্পরায় এ সংবাদ আকবর সাহের কর্ণে পঁহুছিল। আকবর মানসিংহ ও কুমার সেলিমকে অসংখ্য সৈন্যসহ প্রতাপসিংহের দমন জন্য পাঠাইলেন। এই উপলক্ষে ভারতের থর্ম্মপলী—হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের কথা ইতিহাসে পাঠ করিতে আজিও শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রতাপের সে সাহসের কথা,

সে শৌর্য্যের কথা পাঠ করিলে, এখনও সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হয়; এমনই প্রতাপের সে বীরত্ব। এই মহাহবে, রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহের শোণিতে স্বীয় অসি রঞ্জিত করিবার মানসে, প্রতাপ মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু মানসিংহকে না পাইয়া সম্মুখে সেলিমকে পাইলেন। অশ্ববর চৈতক সেলিমের রণহস্তীর পার্শ্বে পাদোত্তোলন করিয়া দিল, প্রতাপের বিষম বল্লম সেলিমের প্রতি ভীমবেগে প্রক্ষিপ্ত হইল। বল্লম লৌহনির্ম্মিত হাওদায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে হস্তিচালকের প্রাণসংহার হইল। হস্তী নিরঙ্কুশ হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ও আপনার প্রভুকে বাঁচাইল। আত্মহারা রণমদমত্ত প্রতাপ একেবারে শত্রুসৈন্যের মধ্যে উপস্থিত। বনবাসী হইলেও প্রতাপ মিবারের রাজচ্ছত্র ছাড়েন নাই। তখনও সে ভীষণ সমরাঙ্গনে সেই লোহিত রাজচ্ছত্র তাঁহার সে গর্ব্বিত শিরোদেশে শোভা পাইতেছে। শত্রুসৈন্য সবলে ভীমবেগে, ভৈরবনিনাদে সেই রাজচ্ছত্রের দিকে ধাবিত হইল। প্রতাপ সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু তথাপি সে ছত্র ছাড়িলেন না। তিনি আসন্ন বিপদের গুরুত্ব বিলক্ষণ বুঝিলেন। কিন্তু সে বীরহৃদয় তাহাতে দমিত বা ত্রস্ত হইল না। প্রতাপ অপূর্ব্ব অসিচালন-কৌশলে তখন শত্রু নিপাত করিতেছেন। তাঁহার সে বিশাল বরবপু শোণিতরঞ্জিত হইয়াছে। শত্রুহস্তে সপ্তস্থান হইতে খরধারে শোণিতস্রাব হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। অবিশ্রান্ত ও অক্লান্ত ভাবে, অসীম উৎসাহের সহিত, তিনি শত্রু সংহারে ব্যাপৃত। এমন সময় ঝালাধিপতি তাঁহার রাজচ্ছত্র স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া শত্রুসৈন্যগণকে প্রতারিত করিয়া প্রতাপকে রক্ষা করিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সেই নীল অশ্ব চৈতক প্রভুকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিল। এরূপ আত্মহারা হইয়া সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া যিনি স্বীয় সঙ্কল্প সাধন করেন, তিনি ধন্য। ধন্য তাঁহার বীরমন্ত্রে দীক্ষা। পুণ্যভূমি হল্‌দীঘাটের সে

ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। সে মহাহবে চতুর্দ্দশ সহস্র স্বদেশপ্রেমিক রাজভক্ত রাজপুতবীর জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কিন্তু আজিও সে গিরিসঙ্কটে তাঁহাদের বীরত্বের কথা যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হল্‌দীঘাটের যুদ্ধের পর, দিন, মাস, বর্ষ গত হইতে লাগিল। প্রবল পরাক্রমশালী মোগলসম্রাট্ ক্রমে ক্রমে প্রতাপের অধিকৃত স্থান সকল একটি একটি করিয়া হস্তগত করিতে লাগিলেন। প্রতাপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিতাড়িত হইতে লাগিলেন। শত্রু ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে, তিনি পরিজনগণ লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। মানুষ আত্মসুখের জন্য তত চিন্তিত নহে। কিসে পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গ সুখে থাকিবে সেইজন্য সে সতত চিন্তাকুল। পাছে মোগলের হস্তে পড়িয়া তাঁহার পরিজনবর্গের নিগ্রহ হয়, পবিত্র শিশোদীয় কুলে কলঙ্কস্পর্শ হয়, সেই চিন্তাই তাঁহাকে সতত বেদনা দিত। তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদের জন্য ব্যস্ত। সেই বনবাসে ভীলগণের সাহচর্য্যে, তাঁহার এমন দিন গিয়াছে, যে পুত্রকন্যাদিগকে খনির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে শত্রুভয়ে লুকাইত রাখিতে হইয়াছে। বনজাত কন্দমূলফলে, নির্ঝরিণীর জলে, ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছে। কথিত আছে, একদিন তাঁহাদিগকে পাঁচবার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া. পাঁচবার তাহা ত্যাগ করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। ইহাতেও সে বীরহৃদয় দমিত হয় নাই। ইহা কি কম কঠোর সাধনা ? কেবল মোগল সম্রাটের সহিত সখ্য স্বীকার করিলে, যিনি রাজোচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারিতেন, তিনি স্বেচ্ছায়, স্বাধীনতার অনুরোধে, শুভ্র যশের জন্য, এ সন্ন্যাস ব্রত স্বীকার করিয়াছেন। আর তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবেন, এই আশায় কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহার মূলে উৎকট প্রতিজ্ঞা, দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন আর কি থাকিতে পারে ?

অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। এই শক্তির সাহায্যে কেহ সাধুকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, কেহ বা অপকর্ম্ম করিতেছে। শিল্পী বৈজ্ঞানিক ইহার সাহায্যে বাষ্পাদি প্রস্তুত করিয়া কত কলকারখানা চালাইতে-ছেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ইহার সাহায্যে কত যজ্ঞকর্ম্ম করিতেছেন। আবার দুর্বৃত্ত দস্যু ইহার সাহায্যে কতশত অসহায় দুর্ব্বলের গৃহদাহ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শক্তির প্রয়োগের ফলাফল প্রয়োক্তার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। এখানে আমরা ইচ্ছাশক্তির আর একটি উদাহরণ দিব। ইহাতে ইচ্ছা-শক্তির প্রবলতা দেখিতে পাইব, কিন্তু প্রয়োগে সাধুতার অভাব দেখিব। ইহা তামসিক। আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি ভারতের ম্যাকিয়াভিলি—কূটরাজ-নীতি-বিশারদ, স্বনামখ্যাত চাণক্য।

মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের আজ শোকোৎসব। অদ্য মহারাজ মহানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধ। রাজবাটীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ তলে বিরাট শ্রাদ্ধসভা হইয়াছে। নানাদিগ্দেশ হইতে লোকজনের সমাগম হইতেছে। সভামধ্যে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণবর্গ এক দিকে সমবেত হইয়াছেন। নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক হইতেছে। অপর দিকে পাত্রমিত্র সকলে সমবেত হইয়া শাস্ত্রালোচনা শুনিতেছেন। কোথাও উৎসর্গের নিমিত্ত সজ্জীকৃত অশ্বগজাদি শোভা পাইতেছে, কোথাও বা সুবর্ণ ও রজত-নির্ম্মিত তৈজসাদি সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত হইতেছে। সাধারণ দর্শকবর্গ সোৎসুক-নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। বাহিরে ভট্টগণ তারস্বরে মৃতের গুণগান ও অক্ষয়স্বর্গের কামনা করিতেছে। সর্ব্বত্র কেমন একটা ঔৎসুক্য ও ব্যস্ততার ভাব লক্ষিত হইতেছে। ব্রাহ্মণকুলজাত প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসের উপর পাত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। তিনি তজ্জন্য সবিশেষ ব্যস্ত আছেন।

কুটিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রু সর্ব্বদাই অশুভ সংসাধনের সুযোগ অন্বেষণে তৎপর। মহানন্দের অন্যতর মন্ত্রী শকটার ইতঃপূর্ব্বে মহানন্দের হস্তে নিগৃহীত ও অপমানিত হন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার মানসে গোপনে গোপনে তিনি উদ্যোগ করিতেছিলেন। একদা তিনি চাণক্যকে একখানি সমগ্র ক্ষেত্রের কুশোত্তোলনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া ও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, রাজনীতিজ্ঞান ও কূট-বুদ্ধির ও পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নন্দবংশের উচ্ছেদের উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিলেন, এবং অধ্যাপকতার ব্যপদেশে পাটলীপুত্র নগরে তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপন করাইয়া দিলেন। এত দিনের পর শকটারের সুযোগ উপস্থিত। অদ্য তিনি চাণক্যকে পাত্রীয় ব্রাহ্মণরূপে সভামধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া কার্য্যব্যপদেশে সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে রাক্ষস মহানন্দের আজ্ঞানুসারে পাত্রীয় ব্রাহ্মণকে সভামধ্যে আনিলেন। কিন্তু পাত্রীয় ব্রাহ্মণের আসনে চাণক্যকে উপবিষ্ট দেখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। চাণক্যের তথাবিধ কৃষ্ণবর্ণ, কুৎসিত আকার ও আরক্তলোচন দেখিয়া বর্দ্ধিত বিস্ময়ে ও ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় আপনাকে এই আসনে কে বসাইয়াছেন? সভামধ্যে এইরূপ প্রশ্নে চাণক্য অতিমাত্র বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া রাক্ষসের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। রাক্ষস শকটারের সকল কথাই অবগত ছিলেন। এখানে তাঁহার এই আস্পর্দ্ধার কথা রাজসকাশে গিয়া প্রকাশ করিলেন। রাজা পূর্ব্বাবধি শকটারের উপর বিরক্ত ছিলেন। অদ্য শ্রাদ্ধসভায় তাঁহার এইরূপ কার্য্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দ্রুতবেগে সভামধ্যে আসিয়া কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাবদন্ত, রক্তচক্ষু চাণক্যের শিখাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আসনচ্যুত করিলেন। এই ব্যাপারে চাণক্য শকটারের দুরভিসন্ধির কথা কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি সভামধ্যে এতাদৃশভাবে অবমানিত হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক

ভূতলে সবলে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, "রে রাজকুলকলঙ্ক দুর্ম্মতি মহানন্দ, তুই সভামধ্যে নিরপরাধ ব্রাহ্মণের যে অবমাননা করিলি, ইহার জন্য একদিন তোকে সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে"। অতঃপর চাণক্য সভাজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "অহে সভ্যগণ, আমি চাণক্য শর্ম্মা; মহানন্দ নিরপরাধে অদ্য আমার শিখাকর্ষণ করিয়া যে অবমাননা করিল, আমি ইহাকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব। আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে. যত দিন নন্দবংশের ধ্বংস করিতে না পারিব, ততদিন আমার এই মুক্ত শিখা বন্ধন করিব না। এই মুক্ত শিখা ইহার কাল-ভুজঙ্গস্বরূপ হইবে"। এই বলিয়া চাণক্য সভাস্থল ত্যাগ করিয়া একেবারে শকটারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সভাজন সকলে বিরাট্ শ্রাদ্ধসভায় দক্ষযজ্ঞের অভিনয় দেখিলেন। নিমন্ত্রিত বিবিধ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিগৃহীত হইতে দেখিয়া যদিও রাজভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না, তথাপি সভাজন লজ্জায় ও ঘৃণায় অবনত-মুখে রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।"

শকটার ব্রাহ্মণের তথাবিধ মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিলেন যে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। অতঃপর মহানন্দের সর্ব্বনাশের আয়োজন করা যাউক। মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া বিষয়ী লোকের ন্যায় মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া শকটার চাণক্যকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কুটিলে কুটিলে একই উদ্দেশ্যে মিলন হইল। চাণক্য কূট-রাজনীতিতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অধিকন্তু তিনি রসায়নাদি নানা দ্রব্যবিজ্ঞানও জানিতেন। তাঁহার এই সকল বিদ্যাবুদ্ধি এক্ষণে মহানন্দের ধ্বংসের জন্য প্রযুক্ত হইল। কৌশলে বিষপ্রয়োগে মহানন্দ নিহত হইলেন। তৎপরে যেরূপে মহানন্দের ভ্রাতা এবং চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ বিনষ্ট হন, যেরূপে চন্দ্রগুপ্ত রাজাসন প্রাপ্ত হন, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত ইতিহাসে আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে। এখানে সে সকল কথার

অবতারণার প্রয়োজন নাই। যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে, অতি দুরূহ ব্যাপারও সম্পাদন করিতে পারে। কুটিল মানবপ্রকৃতিতে প্রতিজ্ঞার বল কি ভয়ঙ্কর! কোথায় দরিদ্র চাণক্য পণ্ডিত, আর কোথায় রাজরাজেশ্বর মগধাধিপতি মহারাজ মহানন্দ। কালবশে চাণক্যের উৎকট প্রতিজ্ঞার সমক্ষে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় তিনি ভাসিয়া গেলেন! এমনই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব! যদিও চাণক্যের এই রাজ্যোচ্ছেদ কার্য্য কোনমতে প্রশংসার্হ নহে, তথাপি ইহা মানবের ইচ্ছাশক্তির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া এখানে ইহার উল্লেখ করা গেল। চাণক্যের এ কার্য্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিহিংসা-সম্ভূত বলিয়া উহাকে তামসিক কর্ম্মের অন্তর্গত করা যায়। তামসিক কর্ম্ম কখন অনুকরণ-যোগ্য নহে। অধিকন্তু বিশিষ্টরূপে নিন্দার্হ। চাণক্যের এই সকল কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া কে বিশ্বাস করিবে যে, মানুষ অবস্থার দাস, ঘটনাচক্রে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়? মানুষ যদি জানে ও বুঝে আর বিশ্বাস করে যে, তাহার মধ্যে শক্তি আছে, তবে সে কেন শবের মত থাকিবে? আপনার গতি সে আপনি ঠিক করিয়া লইবে। গম্যস্থানে যাইবার পথে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে, কোন বাধাই সে গতি রুদ্ধ করিতে পারে না। যদি কখন বিঘ্নের শক্তি আত্মশক্তি হইতে প্রবলতর হয়, তাহা হইলে, সে বিঘ্ন বিনাশ করিবার চেষ্টায় সেখানে দেহপাত করিবে, তথাপি অবসাদগ্রস্ত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পশ্চাৎপদ হইবেন না। এই প্রকার চেষ্টাতেই বীরত্ব—এই-খানেই দুর্ব্বল ও সবলের পার্থক্য।

বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সহাস্যবদনে দেহভস্ম করার দৃষ্টান্ত পুণ্যভূমি-ভারতে বিরল নহে। সতীধর্ম্মের অনুরোধে, পরলোকে স্বামিসহ চিরমিলনের আশায়, ঐহিক সুখ, ঐশ্বর্য্য, স্নেহ, মমতা, সকলই ত্যাগ করিয়া মৃত পতির চিতাপার্শ্বে শয়ন করিয়া ভারতললনা

জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, তিনি কুসুম হইতে কোমল হইলেও সময়ে কুলিশ হইতেও কঠোর হইতে পারেন। সূর্য্যালোকস্পর্শের ভয়ে যিনি অবগুণ্ঠনবতী, তিনি আবার জ্বলন্ত চিতায় পতিপার্শ্বে শোভা পান। এমন দৃশ্য ভারত ভিন্ন আর কোথায় কে দেখিয়াছে?

রাজপুতানার ইতিহাস হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

১৭৮০ সংবৎ। আষাঢ় মাস অমাবস্যা। প্রাবৃটের ঘনঘটা চারিদিক্ ঘেরিয়া আছে। প্রকৃতি যেন পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াই শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। ধীরে ধীরে অজিতসিংহের মৃতদেহ লইয়া তরণী তীরে লাগিল। তীরে চিতা সজ্জিত হইয়াছে। রাজোচিত আয়োজন, ভারে ভারে ঘৃত চন্দন আসিতেছে। ধূপধূনা প্রভৃতি রাশীকৃত করা হইয়াছে। পুণ্যতোয়া নদী সকলের জল কুম্ভে কুম্ভে সজ্জিত। চারিদিকে কেবল একটা বিষাদমাখা ব্যস্ততা দৃষ্ট হইতেছে। রাজকর্ম্মচারীরা চিরন্তন প্রথা অনুসারে রাজান্তঃপুরে শোক-সংবাদ দিলেন। শ্রবণমাত্র রাজমহিষীগণ বাহিরে আসিলেন এবং সকলে অজিতের অনুগমন করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা ভক্তিগদগদ স্বরে, বিষ্ণুর কৃপাভিক্ষা করিলেন - বলিলেন, প্রভো, দেখিও যেন সতীধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি। অতঃপর তাঁহারা সকলে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা বীরের দুহিতা, বীরের বনিতা, বীরের মাতা, তাঁহারা কি কখন মৃত্যুকে ভয় করেন? স্বচ্ছন্দচিত্তে, সোৎসাহে,' আজ সকলে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা নানা রত্নাভরণে বিভূষিতা হইয়াছেন। গন্ধমাল্য সংযোগে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছেন। অমঙ্গলের দিনে মঙ্গলাচরণ! সকলকে একত্র সমবেত দেখিয়া নাজির নাথু কৃতাঞ্জলিপুটে শোকগদ্‌গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, পূজনীয় জননীগণ, আপনারা যে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন, তাহার পূর্ব্বে একবার সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনারা এতাবৎকাল সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে

লালিত হইয়াছেন, সূর্য্যকিরণ স্পর্শেও ক্লেশ বোধ করিয়াছেন, এখন কেমন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় দেহ ভস্ম করিবেন? —এখন মনের যে ভাব আছে, প্রকৃতপক্ষে যখন চিতারোহণ করিবেন, অগ্নির উত্তাপ যখন দেহে লাগিবে, তখন যে সে ভাব থাকিবে, তাহার নিশ্চয় কি? তখন যদি পশ্চাৎপদ হন, তবে নিন্দা রাখিবার আর স্থান থাকিবে না। অধিকন্তু আপনাদের স্বর্গীয় স্বামীর অমলযশে কলঙ্কস্পর্শ হইবে। এই সকল বিষয় স্থিরচিত্তে পুনরায় বিবেচনা করুন"। এই বলিয়া নাজির নাথু নীরব হইলেন। তখন মহিষীগণ কোমল অথচ প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, সতীর সুখ, ঐশ্বর্য্য, যাহা কিছু বল, সকলই পতিগত; পতিপ্রাণা সতী পতিদেহান্তে পতির অনুগমন ভিন্ন অন্য কোন কামনা করে না; ইহাই আমাদের সনাতন কুলধর্ম্ম; তুমি ইহা বিশেষরূপে অবগত আছ; আমরা দৈহিক ক্লেশে কাতর হইব না। নাজিরের যুক্তি ব্যর্থ হইল। অতঃপর মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতি সকলে বিনীতভাবে অজিত সিংহের প্রধানা মহিষী চৌহানীর সমীপে উপস্থিত হইয়া কর-যোড়ে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "দেবি, জননি, এ শোকের উচ্ছ্বাস আর বাড়াইবেন না; আপনি সহগমন সঙ্কল্প ত্যাগ করুন; মহারাজের লোকান্তর গমনে আমরা পিতৃহীন হইয়াছি; এখন যদি আপনি তাঁহার অনুগমন করেন, তবে আমরা মাতৃহীনও হইব; সমগ্র রাজ্য শোকসাগরে নিমগ্ন হইবে; জানিনা সে শোকোচ্ছ্বাস কত কালে প্রশমিত হইবে; রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে; প্রজা-সাধারণের কুশলের জন্য, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আপনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করুন; শাস্ত্রে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা আছে; আপনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পতির অক্ষয় স্বর্গ কামনায় রত থাকুন। তাহাতে সকলের মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সকলে নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ সকলে নীরব নিস্পন্দভাবে রহি-

লেন, তাহার পর চৌহান মহিষী সকলকে সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, এবং এরূপ নির্ব্বন্ধসহকারে পতির অনুগমনের ঐকান্তিক বাসনা জ্ঞাপন করিলেন যে, তাহার পর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা সকলে চিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে পতিপদপ্রান্তে অবলুণ্ঠিতা হইলেন। সে পদারবিন্দ পূজা করিলেন এবং ইহার পর তাঁহারা যথারীতি চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। চিতা প্রদক্ষিণ কালে মহিষীগণ আপন আপন রত্নাভরণ উন্মোচন করিয়া দান করিতে লাগিলেন। এ শোকের কথা আর বাড়াইয়া কাজ নাই। ক্রমে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানাদির পর অজিতের দ্বাদশ মহিষী তাঁহাদের পতির চিতায় শয়ানা হইলেন। চিতায় অগ্নি সংযোগ হইল। দেখিতে দেখিতে সে বিপুল চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পতিদেবতা মহিষীগণ প্রফুল্লবদনে সেই অগ্নিকুণ্ডে স্ব স্ব কুসুমসুকুমার দেহ আহুতি দিলেন। বোধ হইল যেন সতীধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বকীয় স্নেহময় স্নিগ্ধ ক্রোড়ে তাঁহাদিগকে স্থান দান করিলেন। অন্যথা তাঁহাদের সে প্রফুল্লতা, সে বিভা, সে জ্যোতিঃ, কোথা হইতে আসিল? মহিষীগণের কমনীয় দেহের রূপলাবণ্য হরণ করিয়া অগ্নির যেন অধিকতর দীপ্তি হইল। বীরাঙ্গনাগণের এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া সমবেত সকলে ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ে প্রশংসার গীতিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল। সে প্রশংসার প্রতিধ্বনি পুরুষ পরম্পরায় আজিও শুনিতেছে এবং দূরতম ভবিষ্যতেও শুনিবে।

একে একে সিদ্ধার্থ, প্রতাপ, চাণক্য ও দ্বাদশ-মহিষীর কথা বলা হইল। ইহাঁদের প্রত্যেকের কার্য্যের মূলে আমরা কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাই; আর সেই বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিতে পাই। সঙ্কল্প-সাধনার জন্য ইহাঁরা জগতে বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালার আলোচনা করিলে

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মানুষ যদি কোন বিষয় বিচার করিয়া "করিব" বলিয়া স্থির করে, তবে তাহা সম্পন্ন করিতে দেহপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। মানুষের একটী অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। সেটি তাহার ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তির কার্য্যকারিত্বে আমরা যতই আস্থাবান্ হইব, আমাদের চেষ্টাশক্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এই ইচ্ছাশক্তি কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য সিদ্ধার্থের যোগসাধনা, প্রতাপসিংহের স্বদেশোদ্ধারের প্রয়াস, চাণক্যের নন্দবংশ ধ্বংসকরণ, আর অজিত সিংহের দ্বাদশ 'মহিষীর সহমরণে অক্ষয় স্বর্গলাভ' এই বিশ্বাসের জন্য চিতারোহণ এখানে বর্ণিত হইল। ইহাঁদের প্রত্যেকের ইচ্ছাশক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, উহার বিরুদ্ধে কোন বাধা বিপত্তিই দাঁড়াইতে পারে নাই। গিরিনিঃসৃতা সাগরগামিনী নদীর প্রবল স্রোতের গতি যেমন কেহ রোধ করিতে পারে না, তেমনই এই সকল অচল অটল কৃত প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছার সম্মুখে স্নেহ মমতা, সুখ, ঐশ্বর্য্য, দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, শারীরিক নির্য্যাতন কিছুই দাঁড়াইতে পারে নাই। সুখের মোহিনীমূর্ত্তি বা দুঃখের ভৈরবভ্রূকুটী, কিছুই ইচ্ছাশক্তির গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। অভীষ্টবস্তু লাভের জন্য, কামনা পূর্ণ করিবার জন্য, মানুষ আপন দেহমনের উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে। সিদ্ধিলাভ আর দেহমনের পতন, এই দুই সীমার মধ্যে ইহা কার্য্য করে। এই দুই সীমার মধ্যে কোন স্থানে এ শক্তির বিরাম নাই। এমনই উৎকট এ শক্তি। সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গল-বিধাতা, পরমেশ্বর মানবের অন্তরে এই মহাশক্তি দিয়াছেন। আমরা এ শক্তিমাহাত্ম্য বুঝি না। অধিক কি, আমরা অনেকে ইহার অস্তিত্বের কথা পর্য্যন্ত জানি না। এ শক্তির বিষয় জানা আবশ্যক। এই শক্তির পরিচয় পাওয়া আবশ্যক। সেই জন্য প্রথমেই শক্তি-পরিচয়ের কথা বলা গেল।

সঙ্কল্প।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেশে সঙ্কল্পের কথা বলিবার সময় সংযমের কথা মনে আসে। লোকে সামান্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে সংযম করিয়া থাকে। পূর্ব্বদিন এক সন্ধ্যা নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। ব্রতের পূর্ব্বে অসংযত থাকিলে ব্রত পণ্ড হইবে--লোকে এই ভয় করে কায়মনোবাক্যে লোকে শুদ্ধ, সংযত হইয়া ব্রতের সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রত ও কর্ত্তব্য একই। দেবকার্য্যের অনুষ্ঠানপ্রয়াসী ব্যক্তির যেমন শুদ্ধ এবং সংযত হওয়া আবশ্যক, কর্ত্তব্যপালন-প্রয়াসী জনেরও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সংযত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কীর্ত্তি-মন্দিরে যিনি কর্ত্তব্য পালনের জন্য সঙ্কল্প করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অগ্রে কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ ও সংযত হইতে হয়। আত্মসংযমে শক্তিসঞ্চয় হয়। "সংযমী বলী"। "কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্"। এইরূপ লোকই জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। সংযমী ব্যক্তিকে আধুনিক ভাষায় চরিত্রবান্ ব্যক্তি বলিতে পারা যায়।

চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণের সঙ্কল্প সাধু হইয়া থাকে; আর যাঁহার সঙ্কল্প সাধু ঈশ্বর তাঁহার সহায়; পুরুষকার ও দৈবের মিলন হইলে সঙ্কল্প দৃঢ় হয়, সাধনা সহজ হয়, সিদ্ধি নিকটতর হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চরিত্রবান্ হইলে অভীষ্ট ফল লাভের সুবিধা হইয়া থাকে। অন্যথা অসংযত হইলে,—দুশ্চরিত্র হইলে,—অন্তরে রিপু সকল প্রবল হয়, বাহিরে বিঘ্ন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব জানিয়া শুনিয়া

কর্ত্তব্যের পথে বিঘ্নবৃদ্ধি করা উচিত নহে। যদি কোন কর্ম্মেচ্ছু যুবক, এই কীর্ত্তি-মন্দিরে, -এই প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে,—এই সাধনভূমিতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন,—কর্ম্মে কৃতী হইতে চাহেন, তবে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্কল্পের পূর্ব্বেই তাঁহাকে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। সংযমে তিনি বল পাইবেন, সে বল তাঁহার সাধনার সাহায্য করিবে।

বাসনা ও সংকল্পে বিস্তর প্রভেদ আছে। যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্য অবধারণের পর ও তৎসাধনের অব্যবহিত পুর্ব্বে মনের যে প্রতিজ্ঞার ভাব হয়, তাহাকে সঙ্কল্প বলা যাইতে পারে। বাসনা প্রায়ই যুক্তির বশে যাইতে চাহে না। উহা অনেক স্থলে জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নস্বরূপ। মানুষ চতুষ্কোণ গোলক লইয়া খেলা করিবার বাসনা করিতে পারে, কিন্তু তাহা পাইবার জন্য সঙ্কল্প করিতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে. বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য প্রথমে স্থির করিবেন, তাহার পর সবিশেষ বিবেচনা করিয়া, তাহার সাধন-জন্য সঙ্কল্প করিবেন। সংযতচিত্ত হইয়া ভগবৎসমীপে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যসাধনের জন্য সঙ্কল্প করিতে হইবে। এক সময়ে একটির অধিক বিষয়ের জন্য সঙ্কল্প করা উচিত নহে। এইরূপে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কীর্ত্তি-মন্দিরে তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহার পর "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

ব্রতাচারের পূর্ব্বে যেমন সংযমের ব্যবস্থা আছে, ব্রতাচারের মধ্যে তেমনই 'কথা' শুনার বিধি আছে। দেহমনকে অবসাদ হইতে দূরে রাখা আবশ্যক; সেই জন্য যিনি যে মন্ত্রের সাধক, তাঁহার সেই মন্ত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণের কথা শুনা উচিত। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণ কি জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সাধনার সময়ে কত বিঘ্ন পাইয়াছিলেন, কত বিভীষিকা দর্শন করিয়াছিলেন, কি প্রকারে সে সকলকে অতিক্রম

২

করিয়াছিলেন, এবং কত আয়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের বিবরণ তাঁহাদিগের পুণ্য কাহিনীতে শুনা যায়। দুর্ভাগ্য ব্যাধ কিরূপে মহাদেবকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া ভাগ্যলাভ করিয়াছিল, শূদ্র সুষেণ কি উপায়ে কেশব-মন্দিরে উপবাসী থাকিয়া মৃত্যুর পরে যম-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং বহুকাল স্বর্গবাস করে, আর তাহার পর জন্মান্তরে চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া চিত্রাঙ্গদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া কি উপায়ে প্রজাহিতার্থে গোবিন্দের ভজনা প্রচার করিয়াছিল, নিষ্ঠাবান্ ব্রতচারী হিন্দু এখনও সেই পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া উপবাসাদির ক্লেশ লাঘব করেন এবং আশান্বিত হৃদয়ে কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন।

এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনের বহুবিধ কঠোর কর্ত্তব্যসাধনরূপ ব্রতাচরণের সময় আমাদিগের পূর্ব্বোক্তরূপে "কথা" শুনা আবশ্যক। মহাপুরুষগণের জীবনের পুণ্যকাহিনী শ্রবণে আমরা মনপ্রাণকে অবসাদ হইতে রক্ষা করিতে পারিব। মহাজনগণের পদাঙ্ক দর্শনে আমরাও কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

পৌরাণিক পুরুষগণের জীবন এক্ষণে আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে অসমর্থ। "তে হি নো দিবসা গতাঃ। তথাপি সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে ইংরেজের শাসিত ভারতে এমন অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন আমাদের আদর্শস্থানীয় হইতে পারে। আমরা এই গ্রন্থে তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের জীবনের সঙ্কল্প, সাধনা ও সিদ্ধির কথা অলোচনা করিব—দেখিতে পাইব যে, আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্কের অনুগমন করিলে, মানবজীবনের মহোদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সংসাধিত করিতে পারিব।

ভারতে নবযুগ প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ রামমোহন রায়; প্রজারঞ্জক, বহু বিদ্যাবিৎ ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি মহারাজ রামবর্ম্মা; সুমন্ত্রী রাজস্বতত্ত্বজ্ঞ

স্যর মাধবরাও ও স্যর সলর জঙ্গ; দয়াসাগর বিদ্যাসাগর; শিক্ষা-সংস্কারক স্যর সৈয়দ আহম্মদ; বৃহস্পতিকল্প তারানাথ তর্কবাচস্পতি; স্বনামধন্য শ্যামাচরণ; সুবিখ্যাত স্যর মথুস্বামী আর্য্য; অলৌকিক প্রতিভাশালী মধুসূদন; সাহিত্যসেবক অক্ষয় কুমার; ধনকুবের স্যর জেমসেটজী ও রামদুলালের জীবনে অনেকেই আপন আপন জীবনের আদর্শ পাইবেন। ধনীর সন্তান কিরূপে বহুবিধ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া বিদ্বান্ ও স্বদেশ-প্রেমিক হইতে পারেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান কি প্রকারে অনুকূল অবস্থায় পতিত হইলে আপনার বিদ্যাবুদ্ধি-বলে বিশাল রাজ্যের সংস্কারক ও সুব্যবস্থাপক হইতে পারেন, নিঃস্ব দরিদ্র-সন্তান কিরূপে বহু বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া আজীবন বিদ্যা-চর্চ্চা করিতে সমর্থ হন ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন, এ সকল কথা ইহাঁদের জীবনবৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায়। যিনি সাহিত্যসেবা করিয়া মাতৃ-ভাষাব পুষ্টিসাধন করিতে চাহেন, ভাষায় নূতন ভাব আনিতে চাহেন, তিনিও ইহাঁদের মধ্যে স্বীয় মনোমত আদর্শ পুরুষ পাইবেন। দাসত্ববিমুক্ত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে কি প্রকারে ধনসঞ্চয় করিতে হয়, ইহা যিনি জানিতে চাহেন, তিনিও স্বকীয় আদর্শ-পুরুষের চরিত্র ইহাঁদের মধ্যেই পাইবেন।

শক্তি নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জলের ন্যায় স্বাদবিহীন। দেশভেদে সে জলস্রোতে কোথাও মিষ্টরস কোথাও বা লবণরস সংযুক্ত হয়। সেইরূপ মানুষের শক্তি সঙ্কল্প ভেদে কোথাও হিতকর, কোথাও বা অহিতকর হয়। চরিত্রবলের ন্যায় অর্থেরও প্রভূত বল আছে। মানুষ অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া সংসারে কত কি করিতেছে! যেখানে চরিত্রবল ও অর্থবল একত্র সংযুক্ত হয়, সেখানে যদি সাধুসঙ্কল্প আসিয়া মিলে, তবে সে দৃশ্য কত সুন্দর হয়! সেই পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গমের ধারা যে যে দেশ দিয়া যায়, তাহা পূত হয়; আর সেই ত্রিবেণী সঙ্গমের সংস্পর্শে

যাঁহারা আসেন, তাঁহারাও ধন্য হন। রাজা রামমোহন রায় এবং মহারাজ রামবর্ম্মার চরিত্রে এই ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিতে পাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান ভারতে নবযুগের সূচনা। ইংরাজাধিকৃত ভারতের তিনি প্রভাতরবি। সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই পূত-চরিত্রের আলোচনা করা যাউক।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখে লালিত হইয়াও মনুষ্য জীবনের মহত্তর উদ্দেশ ভুলেন নাই। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, রাজার প্রতি, তাঁহার যে কি কর্ত্তব্য, তাহা তিনি ভুলেন নাই এবং সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ফলবতী হইতে দেখিতে পান নাই। পৃথিবীর অতি অল্প মহাপুরুষই আপন আপন প্রবর্ত্তিত সৎকর্ম্মের ফলাফল দেখিয়া যাইতে পান। যাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল ও বিস্তৃত, যাঁহাদের হিতেচ্ছা সর্ব্বজীবে, তাঁহাদের চেষ্টার ফল তাঁহারা সকলে দেখিতে পান না; কিন্তু মানসনেত্রের দূর দৃষ্টিতে তাঁহারা তাঁহা দেখিতে পান এবং সেই জন্যই তাঁহারা দেহপাত করিয়া সে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই সকল মহাপ্রাণগণ যেন দেশকালের অতীত হইয়া জীবিত থাকেন। আমাদের দেশের গৌরবস্থল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর মহাপ্রাণ ও বিশ্ব-প্রেমিক ছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙ্গালার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কি রাজনীতিক, কি সামাজিক, কি শিক্ষাবিষয়ক কোন অবস্থাই ভাল ছিল না। দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে বিশৃঙ্খলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইত। একদিকে মুসলমান রাজত্বের অবসান—অপর দিকে ইংরাজ রাজত্বের ক্রমোদয়—এই রাজশক্তিদ্বয়ের সন্ধ্যাসময়ে সকলই বিকৃত-ভাবাপন্ন বোধ হইত। ভারতের ভাগ্যা-কাশে একদিকে মুসলমান রাজত্বের তমোময়ী নিশার শেষ হইয়া

আসিতেছে, অপর দিকে ইংরাজের নবরাজশক্তির প্রভাময় মহাদ্যুতি বালারুণের ন্যায় অরুণিমা বিকীর্ণ করিয়া পূর্ব্বাকাশে বঙ্গভূমিতে উদিত হইতেছে। রাজশক্তির এই সন্ধিসময়ে বঙ্গদেশে মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের আবির্ভাব হয়।

এই সময়ে দেশে সাধারণের শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বা মিঞাজির মক্তবে, অথবা পণ্ডিতের টোলে শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। অধিকাংশ বালকের বিদ্যাশিক্ষা পাঠ-শালা বা মক্তবে আরম্ভ ও শেষ হইত। উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছা থাকিলেও নানা প্রকার অসুবিধার জন্য তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। তবে যাঁহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিত ও পারিবারিক সঙ্গতি তাদৃশ থাকিত, তাহাদের পক্ষে উহা কতক পরিমাণে সম্ভবপর হইত। রামমোহন রায় এইরূপ সামাজিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া প্রথমে কিছুদিন গুরুমহাশয় ও মিঞাজীর নিকট পাঠগ্রহণ করেন। উত্তরকালে রাজদ্বারে পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইবেন এই আশায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে ১২ বৎসর বয়সে পাটনায় আরবী ও পারসী শিক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। তখন আরবী ও পারসী শিক্ষার জন্য পাটনা প্রসিদ্ধ ছিল। বালক রামমোহন অল্প সময়ের মধ্যে এই দুই ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশী গমন করেন। আরবী ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠান্তে তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইলেন এবং তৎপ্রচারের জন্য যত্নশীল হইলেন। প্রচলিত সহমরণ প্রথা রহিত করিবার জন্য তিনি কৃতপ্রতিজ্ঞ হন এবং দেশে যাহাতে পাশ্চাত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞান প্রচলিত হয়, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা অচল অটল। তাঁহার সঙ্কল্প সাধু। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে আমরা রামমোহনের সাধু সঙ্কল্পের চিহ্ন দেখিতে পাই। সচ্ছল

অবস্থা, অন্যান্য ভোগ সুখের প্রলোভন, অথবা সামাজিক উৎপীড়ন, কিছুই যে সদিচ্ছাসম্পন্ন যুবকের সঙ্কল্পের পথে অন্তরায় হইতে পারে না, একথা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে বেশ বুঝা যায়।

ভগবান্ যাঁহাদিগকে ধনজন দিয়াছেন, সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যাঁহারা প্রতিপালিত, বিষয় বিভবে যাঁহারা সতত উৎফুল্ল, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে জ্ঞানী ও জনহিতৈষী বলিয়া কীর্ত্তি-মন্দিরে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্যপথে যাইতে বিশিষ্ট শক্তির আবশ্যক। আবার সুখৈশ্বর্য্যের মোহাবরণ ভেদ করিয়া, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, তাহার অনুসরণ করিতেও সেই প্রকার শক্তির আবশ্যক। অনশনে বা অর্দ্ধাশনে, নগ্নদেহে বা চীরপরিধানে, শীতের হিমে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে, বর্ষার ধারায় ক্লিষ্ট হইয়া নিজের গন্তব্য স্থানে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। দরিদ্রজনের সাধুসঙ্কল্প ও তৎসাধনের এরূপ অনেক অন্তরায় আছে বটে, কিন্তু ধনীর সাধুসঙ্কল্পের সাধনার অন্তরায়ও অল্প নহে। তিনি সতত এমনভাবে এমন সহচরগণের দ্বারা পরিবৃত থাকেন যে, তাঁহার হৃদয়ে সদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর থাকে না। বাল্যে অতি স্নেহশীল জনকজননী তাঁহাকে কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে দেন না। পাছে কোন কষ্ট হয়, এই ভয়ে তাঁহারা সতত চিন্তাকুল। সুতরাং পরিশ্রম করিয়া পাঠাভ্যাস করা, নিজে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্যের ক্লেশ মোচন করা, হয় ত তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন না। অন্যের দুঃখ দেখিয়া পাছে অঞ্চলের নিধি, নয়নের মণি, স্নেহের গোপালের হৃদয়ে দুঃখ হয়, এজন্য তাঁহাদের আনন্দভবনে দীনদুঃখী, রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। এরূপ পরিবারের সন্তানের হৃদয়ে সদিচ্ছার উদয়ের সম্ভাবনা কম। আর যদিই সদিচ্ছা হয়, তবে তাহা পূর্ণ করিবার অন্তরায় অনেক। যৌবনে ধনীর পুত্র বিষয়সুখে নিয়ত প্রমত্ত থাকে, এবং দুর্দ্দম রিপুসেবায় সুখী হয়,

ইহা তাহার চাটুকার ও পরিচারকবর্গের আন্তরিক কামনা ও প্রয়াস। এরূপ স্থলে যৌবনের শক্তি, উৎসাহ ও উদ্যম যে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পরহিতে নিযুক্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? সদ্বিবেচক না হইলে, সদিচ্ছা না থাকিলে, সাধুসঙ্কল্প না করিলে, সাধনার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্য উভয়ই অন্তরায় হয়। দারিদ্র্যে অবসাদ আনয়ন করে, ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ততা উৎপাদন করে। যখন দারিদ্র্য বা ঐশ্বর্য্য কর্ত্তব্যের পথে বাধা দেয়, তখন উভয়কেই অন্তরায় বলিতে হইবে। আর অন্তরায় অতিক্রম করিতে ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই চরিত্রের বলের আবশ্যক, উভয়েরই সঙ্কল্প দৃঢ় হওয়া চাই, অন্যথা সকলই ব্যর্থ হইবে।

জগতের কীর্ত্তিমন্দিরে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মোহাবরণ ভেদ করিয়া, বিষয়বিভবে মুগ্ধ না হইয়া, কত মহাত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনা করিয়াছেন। এরূপ মহাত্মাদিগের কীর্ত্তিকথা জগতের কীর্ত্তিভবনে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক বিত্তশালী সদিচ্ছাসম্পন্ন সৎকর্ম্মেচ্ছু যুবক কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন।

পুণ্যভূমি ভারতে রাজর্ষিগণের কথা কে না জানেন? জ্ঞানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ইহাঁরা কতই না করিয়াছেন? জ্ঞানের জন্য, সত্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের নিমিত্ত, প্রজাহিতার্থে ইহাঁরা কত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গিয়াছেন। চারিদিকে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি, সুখের উজ্জ্বল চিত্র; তথাপি ভোগ সুখের কামনা তুচ্ছ করিয়া ইহাঁরা আপনাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন, দৃঢ়-পাদবিক্ষেপে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনকের কথা কাহার অবিদিত? রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই ত্রিদিবত্রাস তপস্যার কথা শুনিলে, এখনও দেহে রোমাঞ্চ হয়, ভয়ে ও ভক্তিতে চিত্ত স্তম্ভিত হয়। আমাদের দেশে এরূপ পুরাণকাহিনী অনেক আছে। এখানে সে সব কথা

বাহুল্যভয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল না। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় যে, বর্ত্তমান যুগেও আদর্শ রাজ-চরিত্রের তাদৃশ অভাব নাই। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ রামবর্ম্মার চরিত্র ইহার অন্যতম।* মহারাজ রামবর্ম্মার স্বাস্থ্য বাল্যকাল হইতেই ভাল ছিল না। কিন্তু তাহাতে কি ? তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অদম্য ছিল। তিনি রুগ্ন ও ক্ষীণকায় ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার পাঠানুরাগ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং প্রজার হিতসাধনেচ্ছা কখনও মন্দীভূত হয় নাই। অধিকন্তু ঐ সকল তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া স্বীয় রাজ্যের সুশাসন করিবেন, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল; এবং এই জন্য তিনি বাল্যকাল হইতেই সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন।

মন্ত্রণাকুশল স্যর মাধবরাও ও স্যর সলরজঙ্গের জীবনী পাঠেও

* ১৮৩৭ খৃঃ অঃ ১৯এ মে মহারাজ রামবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মালয় ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৪৯ খৃঃ অঃ স্বনামপ্রসিদ্ধ স্যর টি মাধবরাও মহারাজের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খৃঃ অঃ মহারাজের পিতৃ-বিয়োগ হয়। ১৮৫৯ খৃঃ অঃ ২২ বৎসর বয়সে মহারাজ বিবাহ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ মহারাজ মান্দ্রাজ নগর পরিভ্রমণে আসেন। মান্দ্রাজের তৎকালীন গভর্ণর স্যর উইলিয়াম ডেনিসন ইহাঁর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন 'He is by far the most intelligent native I have seen.' মহারাজ বহুবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন; সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন; স্বয়ং স্বীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং রাজ্যের ও প্রজার উন্নতিকল্পে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া ত্রিবাঙ্কুরকে সে সময়ে আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে তিনি G. C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজ ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইলেও একজন বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি "তুলাপুরুষধাম" ও "হিরণ্যগর্ভ" নামক দুইটি ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং "কুলশেখর পরিমল" উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সালের ৫ই অগষ্ট তারিখে মহারাজের দেহত্যাগ হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক অনেক বিষয় শিখিতে পারেন। উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকিলে এবং প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলে, এখনও ভারতীয় যুবক রাজনীতিকুশল হইতে পারেন। রাজভক্ত হইয়া কিরূপে রাজসেবা করিতে হয়, তাহা এই মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনীতে বেশ জানিতে পারা যায়। রাজার সুনামের জন্য, রাজ্যের কল্যাণার্থ, প্রজার হিতকল্পে, ইঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহার চিহ্ন ত্রিবাঙ্কুর বরোদা ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই করদ-মিত্ররাজ্যত্রয় ইঁহারা কিরূপ অবস্থায় পান এবং শেষে কিরূপ অবস্থায় ত্যাগ করেন, তাহা পাঠ করিলে, ইঁহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। যে সকল শিক্ষিত যুবক রাজভক্ত হইয়া রাজসেবায়, চির-বন্ধুর রাজনীতি ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে চাহেন, এবং দেশের ও সাধারণের মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন স্যর মাধব রাও ও স্যর সলরজঙ্গের জীবনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন।

জনসাধারণের সুশিক্ষার জন্য যে সকল স্বদেশীয় মহাত্মগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে স্যর সৈয়দ আহম্মদের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। ঈশ্বরচন্দ্রকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি একাধারে, বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর, সমাজ-সংস্কারক ও সুশিক্ষাপ্রচারক ছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়, তাঁহার মহিমা সম্যক্ ও সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করা যাইতে পারে না। তথাপি তাঁহার জীবনের পুণ্যকাহিনী না বলিলে অসম্পূর্ণতা দোষ হয়। সুতরাং তাঁহার আজীবন সাধনার বিষয় যে বিদ্যা, তাহা তিনি কি উপায়ে লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই বিদ্যা কি উপায়ে বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই সঙ্কল্পের উল্লেখমাত্র এখানে করা হইল।

বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের

পরিচয় দিয়াছেন, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে মুসলমানগণের সুশিক্ষা বিধানের জন্য স্যর সৈয়দ আহম্মদও সেইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়াছেন। স্যর সৈয়দ আহম্মদ স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের উন্নতির জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন। স্বজাতিহিতৈষণা যে কি পরম পদার্থ, তাহা তাঁহার চরিত্রে উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায়। অধিকন্তু তাঁহার স্বাবলম্বনও বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণের শিক্ষার বিষয়। তিনি আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরাজের অধীনতায় ফৌজদারী আদালতে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর। শেষে সদর আলার কার্য্য করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহাও তাঁহার স্বাবলম্বনের পরিচায়ক বলিতে হইবে।

অধুনা সাধারণের মধ্যে একটি ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত না হইলে, আমাদের দেশের লোকে জীবনে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। হবিষ্যান্নভোজী, ধুতি ও উত্তরীয় পরিধানকারী, নস্যসেবী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কথা আমরা দিন দিন ভুলিয়া যাইতেছি। আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আড়ম্বরশূন্য জীবন আর এখন বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; তাঁহাদের সামান্য অশন বসনে পরি-তোষ, তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা, তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, তাঁহাদের মনের উচ্চতা, এখন ক্রমে কাহিনীর বিষয় হইতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই শ্রেণীর আদর্শ ক্রমেই হারাইতেছি। আর, বোধ হয়, সেই জন্যই আমাদের উৎকট বিলাস বাসনা, নিত্য অভাব ও সতত অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়া শরীর ও মনকে অবসন্ন করিতেছে। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগেও আমরা দুই এক জন আদর্শব্রাহ্মণপণ্ডিত দেখিতে পাই। ইঁহাদের মধ্যে বৃহস্পতিকল্প তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নাম বিশিষ্টরূপে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রধান কার্য্য। এ সম্বন্ধে

তারানাথের জীবন আদর্শস্থানীয় ছিল। বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থপরতা বড়ই প্রবল। লোকে অর্থ ভিন্ন কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। বিদ্যা এখন একটি প্রধান পণ্য। সুতরাং বিদ্যাদানের কথা এখন বড় শুনা যায় না। অধুনা প্রায় প্রত্যেক সহরে সুলভ বিদ্যালয় দেখা যায়। ইহার অধিকাংশকে বিদ্যাবিপণি বলা যাইতে পারে। বিদ্যাদান বা সুশিক্ষা বিস্তার এগুলির উদ্দেশ্য নহে। এগুলির উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে, কোন পল্লীতে দুই চারিটি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র থাকিলে অনেক নিম্নশ্রেণীর ছাত্র তাহাদিগের নিকট পাঠ বুঝাইয়া লইত। এখন আর তাহা দেখা যায় না। এমন কি, সামান্য পল্লীগ্রামেও "প্রাইবেট টিউটার" নামক একশ্রেণীর পণ্যজীবী দেখা যায়। সুতরাং আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে 'বিদ্যাদান' কথাটা বড়ই বিরল হইয়া উঠিতেছে। তারানাথ এ বিষয়ে এক প্রকার অসাধারণ ছিলেন বলা যাইতে পারে। একবার জৈনদিগের প্রধান আচার্য্য বিজয়গচ্ছ কলিকাতায় আসেন এবং সেই সময় তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্যের সংস্কৃত শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য তারানাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার শিষ্যকে পড়াইবার জন্য মাসিক ৩০০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন,এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে তারানাথ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ; কারণ তদ্দ্বারা আমরা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। তিনি বিজয়-গচ্ছকে বলিলেন, "বিদ্যাদান করাই আমার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প। বিদ্যা বিক্রয় করা অতি পাষণ্ডের কর্ম্ম। আপনার প্রধান শিষ্য এবং অন্যান্য জৈনধর্ম্মাবলম্বী যে কোন লোক বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিবেন, আমি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগকে বিদ্যা দান করিব।" বিদ্যাদান যে তাঁহার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প ছিল, তাহা তিনি নিজ মুখে জীবনের শেষভাগে প্রকাশ করেন।

কৃতী পুরুষগণের পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিলে, আমরা তাঁহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিমাণ সুন্দররূপে বুঝিতে পারি। মান্দ্রাজ হাই-কোর্টের সুবিখ্যাত জজ, স্যর মথুস্বামী আর্য্য, কে, সি, এস, আই, এবং বঙ্গদেশের হাইকোর্টের প্রধান দ্বিভাষী, বহুভাষাজ্ঞ, ব্যবহার-শাস্ত্রবিৎ শ্যামাচরণ সরকারের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য কিরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। প্রথম জীবন দুই জনেই ঘোর দারিদ্র্যে অতিবাহিত করেন। দুই জনেই শৈশবে পিতৃহীন হন। একজন মাতৃভাষা সামান্যরূপ শিক্ষা করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে মাসিক এক টাকা বেতনে চাকরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আর একজন দারিদ্র্যপ্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ ইঁহাদের মধ্যে একজন শেষে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি হন, অপর জন বাঙ্গালার হাইকোর্টের প্রধান দ্বিভাষীর পদ পান। দারুণ দুর্দ্দশা অতিক্রম করিয়া এ প্রকার সৌভাগ্য অর্জন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল না হইলে, অবস্থার এরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন কদাপি সম্ভবপর নহে। মথুস্বামী ও শ্যামাচরণ উভয়েরই ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেই জন্য দারিদ্র্য ইঁহাদের সংকল্পের অন্তরায় হইতে পারে নাই, বয়সের আধিক্য তাঁহাদের শিক্ষার প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই। একজন গ্রাম্য হিসাবনবীশের সহকারিতা করিয়া অবসর সময়ে নিকটস্থ বিদ্যালয়ে গিয়া ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অপর জন একবিংশতি বৎসর বয়সে ইংরাজি শিক্ষার্থ হিন্দুকলেজে প্রবেশলাভ করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হন। যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত ও শ্রমকাতর, তাহারা এইরূপ অবস্থায় পড়িলে সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু ধীরচরিত্র ব্যক্তির কথা অন্যরূপ। মথুস্বামী ও শ্যামাচরণ আপন আপন জীবনে তাহা সুন্দর-

রূপে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনোহরচরিত যতই আলোচনা করা যায়, ততই বুঝা যায় কর্ম্মের মূলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আবশ্যক। অচল হিমগিরি সচল হইতে পারে, চন্দ্রসূর্য্য আপন আপন কক্ষভ্রষ্ট হইতে পারে, তথাপি জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না; এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই জগতে কৃতিত্ব লাভ করেন। অন্যথা কল্পনাযোগে শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণ করিলে, পদে পদে হতাশ হইতে হয়। প্রতিকূল ঘটনায় যাহাদের সঙ্কল্প বিলুপ্ত হইয়া যায়, ক্ষুদ্র বিঘ্নে যাহারা হতাশ হয়, ঐশ্বর্য্যে যাহারা উৎফুল্ল হইয়া আত্মহারা হয়, দারিদ্র্যে যাহারা অবসন্ন হয়, তাহাদিগের দ্বারা জগতে কবে কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে? অল্পবুদ্ধি বরং ভাল, স্বল্পবিত্ত বরং শ্রেয়ঃ, দুর্ব্বলদেহ বরং প্রার্থনীয়, কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ততা কদাপি ভাল নহে। ভগবানের কৃপায় সতত আস্থাবান হইয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে সাহসে নির্ভর করিয়া, কৃতসঙ্কল্প হইয়া যিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তিনি পুরুষ নামের উপযুক্ত। মথুস্বামী ও শ্যামাচরণে এই পৌরুষ ছিল; এবং এই জন্যই কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা আমাদের যুবকগণের আদর্শ স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন।

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালাভাষা যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গভাষা সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে সকল মহাত্মার সাধনায় বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে দত্তদ্বয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গদ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত ও পদ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ইঁহারা কি প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশীয় যুবকগণের জানা উচিত। যে সকল যুবক জাতীয় সাহিত্যোন্নতির ইচ্ছা হৃদয়ে

পোষণ করেন, তাঁহারা যেন এই সাহিত্যসাধকদ্বয়ের জীবনী মনোযোগের সহিত পাঠ করেন।

যদি কোন যুবক আর্থিক ও শারীরিক ক্লেশকে আপন সঙ্কল্প সাধনার অন্তরায় বিবেচনা করেন এবং তজ্জন্য নিরাশ ও অবসন্ন হন, তবে তিনি যেন অক্ষয়কুমারের সাধনার কথা শুনেন। অক্ষয়কুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অর্থাভাবে বিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। দরিদ্রতা হেতু অল্প বয়সে তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় থাকিতে হয়। ১৯ বৎসর বয়সে তত্ত্ববোধিনীপাঠশালায় ৮৲ বেতনে তিনি পণ্ডিতের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। বাল্যে কিঞ্চিৎ পারসী এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে কিছু ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। শার্দ্দূলশিশু শোণিতের আস্বাদন অল্প পাইলেও তাহা ছাড়িতে চাহে না। তাহার জন্য সে কোন বাধা মানে না। অক্ষয়কুমারও সেইরূপ বিদ্যার স্বাদ যদিও বাল্যে অতি অল্পই পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। পরিবার প্রতিপালন ও জীবিকার জন্য অল্প বেতনে শিক্ষকতা করিয়া তিনি ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে ক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হন। তিনি দেহ পাত করিয়া জ্ঞানের সেবা করিয়াছিলেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। বাল্যকালের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জীবনে পূর্ণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে।

কবি কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন বলিয়া একটি কিংবদন্তী আছে। তিনি এক সময়ে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, "উষ্ট্র" শব্দ স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের সেই এক দিন, আর রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূতের রচনার কাল আর এক দিন। মূর্খতা ও পাণ্ডিত্য এই দুইয়ের চরমসীমা কালিদাসের জীবনে

দেখা যায়। আর বোধ হয় সেই জন্যই লোকে তাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলে। অর্থাৎ তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া কঠোর সাধনা দ্বারা বাগ্‌দেবীকে প্রসন্ন করিয়া বর পাইয়াছিলেন। এই অর্থে মধুসূদন দত্তও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তিনি এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় এত অজ্ঞ ছিলেন যে, "পৃথিবী" ও "প্রথিবী" এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি শুদ্ধ তাহা বুঝিতেন না। আবার যখন দেখি যে, এই মধুসূদনই বাঙ্গালা পদ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তখন বিস্মিতচিত্তে তাঁহার অসাধারণ সঙ্কল্প ও সাধনার কথা চিন্তা করি। এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। সেই বিজাতীয় ঘৃণা অতিক্রম করিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠে প্রবৃত্ত হওয়ায়, এবং তাহার পরে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ছাত্রের ন্যায় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করায়, যে তাঁহার মনের অসাধারণ বল প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই স্থানে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিতে পাই। পরে সেই সঙ্কল্পের সাধনা যে কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতে পাই। মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ করিলে, এবং মধুসূদন "মাইকেল" না হইলে, হয়ত লোকে অনায়াসে তাঁহার এই বিদ্যালাভকে দৈবাধীন বলিত এবং বাগ্‌দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছেন বলিয়া একটা কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিত। মধুসূদন কিপ্রকার বিসদৃশ অবস্থায় পতিত হইয়াও বঙ্গভাষার উন্নতির সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে পাওয়া গেল।

এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর লোক আপন আপন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলের যে কোনটি লাভের জন্য যিনি সাধনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহারই পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সাধককে আদর্শ পাইয়াছেন। এতক্ষণ অন্য অন্য

শ্রেণীর সাধকগণের কথা বলিলাম। এইবার লক্ষ্মীর উপাসকগণের কথা বলিতেছি। ইহারা "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মন্ত্রের উপাসক। বণিক্‌প্রবর রামদুলাল সরকার ও স্যার জেমসেটজী জিজিভাই এই শ্রেণীর সাধক ছিলেন।

রামদুলাল ও জেম্‌সেটজী উভয়ে ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েরই বাল্যজীবন দুঃখে, দারিদ্র্যে অতিবাহিত হয়। রামদুলাল অল্প বয়সে পিতা মাতা হারাইয়া মাতামহ ও মাতামহীর ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রতিপালিত হন। জেমসেটজীর শৈশবে মাতৃপিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি শ্বশুরের অন্নে কিছুদিন জীবন ধারণ করেন। রামদুলাল উত্তমরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সুশিক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাগজের অভাবে তাঁহাকে কদলী পত্রে লিখিতে হইত। জেমসেটজীর লেখাপড়া শিক্ষার কথা তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তবে তিনি গুজরাটী ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারিতেন এবং যৎসামান্য ইংরাজী জানিতেন। বাঙ্গালী রামদুলাল ৫৲ টাকা বেতনে চাকরী আরম্ভ করেন। পারসী জেমসেটজী কিছুদিন দোকানে বিনা বেতনে শিক্ষানবীশ ছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতে দুইজনেরই বাণিজ্যের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। একজন তাঁহার সামান্য আয় হইতে অতি কষ্টে শত মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া কাঠের ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন, অপর জন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ১২০ মুদ্রা লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। আপাত দৃষ্টিতে ঘটনা দুইটি সামান্য বোধ হয়; কিন্তু যখন আমরা এই প্রসিদ্ধ বণিগ্‌-দ্বয়ের উত্তর জীবনের কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ করি, তখন ঐ দুইটী সামান্য ঘটনারই মধ্যে তাঁহাদের সঙ্কল্পের অবিনশ্বর অঙ্কুর দেখিতে পাই। অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত সেই সঙ্কল্পের কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র ভারতে আজ এই সিদ্ধ

পুরুষদ্বয়ের পুণ্যকথা ঘোষণা করা আবশ্যক। দাসত্ব-প্লাবিত দেশে কি উপায়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা শিখিবার জন্য এই দুই কৃতী পুরুষের জীবনী পাঠ করা আবশ্যক।

ক্রমে ক্রমে আমরা কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবনের সঙ্কল্পের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। সঙ্কল্পের কথা চিরকালই সংক্ষেপ হইয়া থাকে। ঐ যে বিশাল বিস্তৃত বটবৃক্ষ—যাহার বিস্তার দেখিয়া এখন আমরা বিস্মিত হইতেছি,—কিছুকাল পূর্ব্বে উহা ক্ষুদ্রতম বীজে প্রকৃতির সঙ্কল্পরূপে লুকায়িত ছিল। জগতে মহাপুরুষগণের যে সমুদায় মহীয়সী কীর্ত্তি দেখিতে পাই, সেগুলিও একদিন সেই মহা-পুরুষগণের হৃদয়ের অন্তস্তলে সঙ্কল্পরূপে অতি সঙ্কীর্ণভাবে লুক্কায়িত ছিল। সাধনায় সঙ্কল্পের বিকাশ, সিদ্ধিতে তাহার স্থিতি। সঙ্কল্পের সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এক্ষণে সঙ্কল্প সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, উহা গোপনে রাখা আবশ্যক। মানবচরিত্রজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।" অধিকন্তু সঙ্কল্প—"প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ।"

সাধনা।

সিদ্ধিদাতা ভগবানকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঈপ্সিত বস্তুকে ধ্রুব তারার ন্যায় নিরন্তর সম্মুখে রাখিয়া গম্যপথে যাইতে হইবে। অন্যথা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে, বিপথে গমন করিলে, বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষকার প্রধান সহায় এবং অবলম্বন হইলেও দৈবানু-গ্রহ উপেক্ষণীয় নহে। সাধনায় পুরুষকার ও দৈবের সম্মিলনে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হয়। অতএব কর্ম্মেচ্ছু যুবক মাত্রেরই ভগবদ্ভক্ত হওয়া আবশ্যক। আত্মশক্তিতে ও সঙ্কল্পে যেরূপ অচল অটল বিশ্বাস ব্যতি-রেকে সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র হয়, তদ্রূপ ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় ও কৃপায় দৃঢ়বিশ্বাস ব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের অগ্রসর হইবার প্রয়াসও একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হয়—আশা ভগ্ন হয়—এবং ক্রমে সাধনা ব্যর্থ হয়। নাস্তিকের জীবন নিরাশ। ইহ পরকালে কোথাও তাঁহার আশা নাই। তাঁহার সুখ দুঃখ আত্মগত। তাঁহার দেহের সহিত তাঁহার সকলই ফুরাইয়া যায়। সিদ্ধিতে সন্দিহান হইলে তিনি সাধনা ছাড়িয়া দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নাস্তিক বা ভগবৎকৃপায় অনাস্থাবান ব্যক্তির সাধনা বিড়ম্বনা মাত্র।

অন্যত্র আস্তিক ভগবদ্ভক্তজনের পক্ষেও সাধনা সহজ নহে। তবে উভয়ে প্রভেদ এই যে, একজন নিরাশ হৃদয়ে সমস্ত কৃতিত্ব নিজের এই বিশ্বাস লইয়া কার্য্য করেন। অপর জন আশার আলোকে সঙ্কল্পিত বিষয় সম্মুখে রাখিয়া, আত্মশক্তি বা পুরুষকারে বিশ্বাস করিয়া, আরব্ধ কার্য্যে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধি বা জয় পরাজয়ের

চিন্তা না করিয়া, কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করেন। একজন কর্ম্মফল, কৃতিত্ব নিজেতে আরোপ করেন। অন্যে নিজকৃত সাধনার ফল সিদ্ধি-দাতা পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি কর্ত্তব্যবোধে সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া থাকেন--কর্ম্মে মাত্র তাঁহার অধিকার আছে—কর্ম্মফল ভগবানের হস্তে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সংক্ষেপতঃ যিনি এইরূপে, মনে প্রতিজ্ঞার বল, মস্তকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, হৃদয়ে ভক্তি. ও বাহুতে শক্তি লইয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন—তিনিই ধন্য—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তিনিই আদর্শপুরুষ।

সাধনার অনেক অন্তরায়। ঐশ্বর্য্যের উল্লাস, ও দারিদ্র্যের অবসাদ উভয়ই অন্তরায়। সুখৈশ্বর্য্যে আত্মহারা হইয়া কেবল ভোগ বিলাস ও পাপলালসার বৃদ্ধিতে সাধনা পণ্ড হয়। আবার দারিদ্র্যজনিত অভাবে ভয় লোভ ও ঈর্ষা প্রভৃতির বৃদ্ধি পাইয়া চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করে। এই সকল দমন করিবার জন্য আত্মসংযম শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদের দেশে লোকে জীবনকে ব্রত স্বরূপ বিবেচনা করে এবং সেই জন্য আমাদের সর্ব্ব কার্য্য ধর্ম্মসম্পর্কিত। ভোজনে জনার্দ্দন হইতে শয়নে পদ্মনাভ পর্য্যন্ত দিবারাত্র সর্ব্বকর্ম্মে ভগবানকে কোন না কোন রূপে স্মরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। আরও দেখা যায়, যাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে হবিষ্যান্ন বা নিরামিষ কিংবা অলবণ আহার করিয়া সংযম করেন। সুতরাং সংযম কথাটি কাহারও নিকট বড় নূতন নহে। নিত্য নৈমিত্তিক ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্রতাদির পক্ষে যখন এরূপ ব্যবস্থা, তখন ইহপরকালব্যাপী এই জীবনমহাব্রতের উদ্‌যাপনের জন্য কি পরিমাণে আত্মসংযম আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুর কোন না কোনটি প্রবল হইলেই সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। অতএব সর্ব্বকার্য্যে রিপুর

দমন চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যথা শ্রেয়ঃ নাই। প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে চলিলে, সর্ব্বদা বিপথ গমনের শঙ্কা থাকে এবং তাহাতে প্রায়ই বিপদ ঘটে। প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে কার্য্য করিলে, মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব হারায়। বিবেক ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি ম্লান হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রিপু-পরবশ সে ক্রীতদাস অপেক্ষাও হীন। ক্রীতদাসের শারীরিক স্বাধীনতা নাই। কিন্তু যে রিপুর দাস, তাহার শারীরিক বা মানসিক কোন স্বাধীনতাই নাই। যাহার মন সতত পাপপথগামী তাহার দেহ কি প্রকারে অন্যপথগামী হইতে পারে? এইরূপ রিপুপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা কখন কোন সৎকার্য্য সম্ভবপর নহে। জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য সাধন তাহার দ্বারা কিরূপে হইতে পারে? জীবনকে উন্নত করিতে হইলে, জীবনকে মহৎ করিতে হইলে, রিপু বশ করিতে হইবে। যখন মানব রিপুনিচয়কে নিজ অধিকারে আনিতে পারেন, তখন ত রিপু সকল পরিচারকের ন্যায় তাঁহার সাধনের সহায় হইয়া থাকে।

রিপু-দমন চরিত্র গঠনের সাহায্য করে। চরিত্রবান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রশংসিত হয়েন। তাঁহার সচ্চরিত্রতার জন্য তাঁহার সাধুতার জন্য, তিনি স্বয়ং আপনার মধ্যে যেমন একটি অব্যক্ত শক্তি অনুভব করেন, তেমনই আবার অপর সাধারণেও তাঁহার চরিত্রের শক্তি বুঝিতে পারে। লোকে তাঁহার গন্তব্যপথে বাধা দিতে সাহস করে না। চরিত্রবান্ ব্যক্তি আলোকস্বরূপ—স্বপ্রকাশ। তিনি যেখানে উপস্থিত হয়েন, কুলোকসকল অন্ধকারের ন্যায় সেখান হইতে দূরে যায়। চরিত্রের এমনই মহিমা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিঘ্নবহুল সাধনক্ষেত্রে চরিত্রের প্রভাবে বহু বিঘ্ন দূর হয়। এরূপ স্থলে কোন বুদ্ধিমান কর্ম্মেচ্ছু যুবক আত্মসংযমাদি দ্বারা চরিত্র গঠনের চেষ্টা না করিবে? নিষ্কাম ধর্ম্মের হিসাবেই হউক, অথবা সকাম সাংসারিকতার হিসাবেই হউক, সচ্চরিত্রতার প্রভাব ও মর্য্যাদা যথেষ্ট।

আত্মসংযম ও চরিত্রগঠন জীবনব্যাপী কার্য্য। "আমি আত্মসংযম ও চরিত্রগঠন করিয়াছি, এক্ষণে নিশ্চিন্ত থাকা যাউক" এরূপ কথা কেহ কখন জীবনে বলিতে পারেন না। নগর অধিকার করিয়া, শত্রুসেনা পরাজিত করিয়া, কোন দিন নিশ্চিন্ত থাকা বরং সম্ভব, কিন্তু মানবের ষড়রিপু দমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব। এ জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের রিপু ও চরিত্রবিষয়ে সতত সতর্ক থাকেন। অভ্যাসযোগে কিছু দিন রিপুগণ দমিত থাকিলে, অনেকটা শান্তভাব ধারণ করে। যখন এইরূপে আত্মসংযম অভ্যস্ত হইয়া আসে, চরিত্র গঠন হইতে থাকে, তখন অন্তরের চঞ্চলতা চলিয়া যায়। বৃথা বাসনায় চিত্তে চঞ্চলতা উৎপাদন করে না। তখন অধ্যবসায় আসে। আশা ও অধ্যবসায় সাধনার প্রাণ। আশা ও অধ্যবসায় না থাকিলে, সাধনা হইতে পারে না। দীপবর্ত্তিকা নিবাত নিষ্কম্প হইলেও তৈলের অভাবে নিভিয়া যায়। সেইরূপ চিত্ত সংযত হইলেও আশা ও অধ্যবসায় না থাকিলে, সাধনা স্থায়ী হইতে পারে না, এই নিমিত্ত আশা ও অধ্যবসায় আবশ্যক।

নিরানন্দ হইয়া সাধনা করা বড় কষ্টকর। আশান্বিত-হৃদয়ে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত সাধনায় রত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমশঃ সাধনা প্রীতিকর হইবে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, যুবকগণ ঈশ্বরবিশ্বাসী হইবে। ভক্তবিশ্বাসিগণ বলেন যে, ভগবান আনন্দস্বরূপ। তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে আস্থাবান হইয়া নিরানন্দ থাকা ভাল দেখায় না। তাহা হইলে, কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকিবে না—একটি অপরটির প্রতিবাদ করিবে। আনন্দই জগতের নিয়ম। দুঃখ তাহার বিকারমাত্র। অথবা আনন্দ সম্যক্‌ভাবে অনুভব করিবার জন্যই দুঃখের সৃষ্টি। আনন্দ জীবনবর্দ্ধক। দুঃখ জীবনক্ষয়কারী। অতএব মনকে সর্ব্বদা এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, তাহা যেন সর্ব্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকে। দুস্তর সাগর বক্ষে

অনেক ভাসমান "বয়া" দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলিকে দেখিয়া নাবিকগণ তাহাদের পথ নির্ণয় করে। ঐ বয়া সকল প্রবল তরঙ্গাঘাতে বা ঝটিকাবর্ত্তে নিমগ্ন হয় না। সকল সময় সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া ইহারা ভাসমান থাকে, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে আপনাদের কার্য্য করে। আমাদের হৃদয় যাহাতে ঐ প্রকারে অবস্থার উপর ভাসমান থাকে, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। হৃদয় ও মনকে এইরূপে প্রসন্ন রাখিতে হইলে, আশার আবশ্যক। আশা ভিন্ন আনন্দ স্থায়ী হইতে পারে না; যুগে যুগে যত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আশাতে ভগবানের আশ্বাসবাণী শুনিয়া, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও, প্রসন্ন চিত্তে আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমরাও আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে কি দেখিতে পাই? আশা। আশার আলোকে যদি ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিয়া কিছু না দেখিতে পাইতাম, তবে কিসের জন্য এত উদ্যোগ, এত আয়োজন? আমাদিগের শ্রম, অর্জ্জন এবং সঞ্চয়ের মূলে আশাই দেখিতে পাই। আশান্বিত হইয়াই লোকে ভূমিকর্ষণ করে, বীজ বপন করে, তাহাতে জল সেচন করে। আশা না থাকিলে এ সকল কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আশা কর্ম্মের জীবনস্বরূপ—কর্ম্ম যত অগ্রসর হয়, আশা তত বৃদ্ধি পায়।

আশা অধ্যবসায়কে স্থায়ী করে। অধ্যবসায় সাধনার প্রধান অঙ্গ। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় না থাকিলে সকল সাধনা ব্যর্থ হয়। অধ্যবসায় এবং সাধনা, আলো ও উত্তাপের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সাধন-ক্ষেত্রে সকল অন্তরায়কে অতিক্রম করিতে হইলে, অধ্যবসায় আবশ্যক। বারংবার বিফলপ্রযত্ন হইয়া বাধা পাইয়াও সাধনা করিতে হইবে; অন্যথা সামান্য বাধায় কাতর হইলে সকলই পণ্ড হইবে। কথিত আছে, ধর্ম্মজগতে সাধনক্ষেত্রে "মারের" প্রবল প্রতাপ। "মার" নানামূর্ত্তি

পরিগ্রহ করিয়া সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কখন ভোগসুখের নানা মনোরম চিত্র সম্মুখে ধরিয়া, সে সাধককে বলে,—"কেন এমন কমনীয় বপু, তপ্তকাঞ্চননিভ বর্ণ, কঠোর ধর্ম্ম সাধনে ক্ষীণ ও মলিন করিতেছ? সংসার দুদিনের জন্য। তুমি চলিয়া গেলে কি থাকিবে? কিছুই না। তবে কেন এমন করিয়া মরিতেছ? সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সাধনা করিও না। আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ, তোমার সম্মুখে কত লোক মর্ত্তে স্বর্গের সুখ ভোগ করিতেছে, জীবন যৌবন সার্থক করিতেছে—কেমন বিলাস বিভ্রমে দিন কাটাইতেছে। দেখ সদ্যঃ প্রস্ফুটিত গোলাপের শোভা ক্ষণস্থায়ী; হেলায় যদি তাহা উপভোগ না কর, তবে কালের কঠোর নিয়মে তাহা ঝরিয়া যাইবে। অতএব এ নশ্বর জীবন, ক্ষণস্থায়ী যৌবন, এ ক্ষণবিধ্বংসী দেহ, এমন করিয়া অজ্ঞাতফল ধর্ম্মের জন্য ভাসাইয়া দিও না। একবার যাইলে পুনরায় যে আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? অতএব যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভোগসুখে জীবন-যৌবন সার্থক কর।" এইরূপে নানা ছন্দে "মার" সাধকের মন বিচলিত করিতে চেষ্টা করে। এই সকল চিত্র দর্শনে "মারের" প্ররোচনায় অনেকেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সাধনভূমি হইতে দূরে যান। আবার অনেকে সুখের এই মোহময় চিত্রে মুগ্ধ হন না। কখনও বা তাঁহাদিগকে অন্য উপায়ে সাধনভ্রষ্ট করিবার জন্য "মার" বিশেষ চেষ্টা করে। তাঁহাদিগকে বিভীষিকা দেখায়। শ্মশান-ক্ষেত্রের শব সাধনার প্রথম অবস্থায় তান্ত্রিক যেমন নানা প্রকার বীভৎস পিশাচমূর্ত্তি দেখেন, সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মশীল কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তব্য সাধনে যে তদ্রূপ নানা বিভীষিকা দেখিতে পাইবেন—তাহার আর বিচিত্র কি? মানবের কর্ম্মক্ষেত্রেও যেন "মার" কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং কল্পনার সাহায্যে তাঁহাকে নানা দুঃখের চিত্র দেখায়। পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া কষ্ট

দেয়। দুঃস্থ স্নেহশীল আত্মীয়জনের পীড়ার চিত্র অথবা অন্য কোন প্রকার বিচ্ছেদ, মনঃকষ্ট, বা পারিবারিক দুর্ঘটনার চিত্র দেখাইয়া তাঁহাকে ভীত ও অবসন্ন করিতে প্রয়াস পায়। ইহাতে যিনি কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না—"মার" তাঁহার সম্মুখে মিথ্যাযুক্তির সাহায্যে তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মের ঔচিত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত করে! যখন সাধনা করিতে করিতে দেহমন ক্ষণিকের জন্য অবসন্ন হয়, সেই সময় "মার" অবিশ্বাসকে সাধকের মনে প্রবেশ করিতে বলে। যুক্তি তর্কস্থলে মিথ্যাযুক্তির দ্বারা, কুটন্যায়ের সাহায্যে, তাঁহার মনে ভগবানে অনাস্থা এবং আশায় নিরাশা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে। এই সকল সঙ্কটে অধ্যবসায় আবশ্যক। অধ্যবসায় না থাকিলে অবসাদে দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিজ কর্ত্তব্যের ঔচিত্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সঙ্কল্প শিথিল হয়, সাধনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। এই সকল বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক। এই জন্য ভগবানের কৃপায় দৃঢ়বিশ্বাস রাখিতে হইবে, তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করিতে হইবে সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিতে হইবে—আর সর্ব্বোপরি অধ্যবসায় সহকারে দেহপাত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া সাধনায় রত থাকিতে হইবে। ইহাই সাধনার প্রকৃষ্টরীতি—ইহাই সিদ্ধির সুগমপথ - ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্কল্পের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সাধনপ্রসঙ্গ বিবৃত করা যাউক। যখন রামমোহন রায় আরবী পারসী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য পাটনায় আসেন, সে সময়ে দেশে গমনাগমনের জন্য সুগম ও নির্ব্বিঘ্ন পথ ছিল না। তখন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির কথা কেহ জানিত না। বিদেশ যাত্রা করা একটা বিষম ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। স্থলপথে ব্যাঘ্র ভল্লুক ও বন্যশূকরাদির আক্রমণ হইতে যদিও কোন রূপে লোক আত্মরক্ষা

করিতে পারিত কিন্তু দস্যুদল ও ঠগদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই সুকঠিন ছিল। ঠগেরা নানা বেশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। কখন সাধু সন্ন্যাসীর বেশে, কখন বণিকের বেশে, কখন বা ভদ্রলোকের বেশে, পথিকের সহিত পথে কিংবা পান্থশালায় মিলিত হইত এবং পথিককে বিপথগামী করিয়া, সুযোগ মত সঙ্কেত দ্বারা আপন দলস্থ অন্যান্য ঠগদিগকে একত্র করিয়া, পথিকের প্রাণ নাশ করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিত। জলপথেও বিঘ্ন কম ছিল না। জলদস্যু বোম্বাটীয়াগণ নৌকার কাছে কাছে বেড়াইত এবং সুযোগ মত নৌকা লুণ্ঠন করিত। তখন পুলিসের এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল না। বিদেশ গমনের পথের বিবরণ শুনিলেই অনেকের অঙ্গের শোণিত শীতল হইয়া যাইত। ধনতৃষ্ণা, জ্ঞানতৃষ্ণা সমস্তই হৃদয়ে বিলীন হইয়া যাইত। অধুনাতন সর্ব্বদেশচর বঙ্গবাসীর পক্ষে সে দিনের কথা কষ্টকল্পনার বিষয়। তখন ধনার্জ্জনের জন্যও বঙ্গবাসী বিদেশে কম গমন করিতেন। অপ্রবাসী হইয়া শাকান্নভোজী হইয়া থাকাও তখন লোকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত। সম্পন্নব্যক্তি নিজের জমিদারীর আয়, সচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থ লাখেরাজ দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর জমির উৎপন্ন শস্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। শ্রমজীবী স্বীয় ব্যবসার দ্বারা আপনার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া স্বদেশেই থাকিত। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, লোকে বিদেশ গমনের কথা মনেই আনিত না। দেশের ও সমাজের যখন এমন অবস্থা তখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য দ্বাদশ বর্ষীয় বাঙ্গালী বালকের সুদূর বিহার প্রদেশে আসা নিরতিশয় সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে। জ্ঞানান্বেষণে পাটনায় আগমন রামমোহনের জীবনের সাধনার আরম্ভ।

পাটনায় অধ্যয়নকালে মহম্মদীয় শাস্ত্র সমূহে একেশ্বরবাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত পৌত্তলিকতায় সন্দেহ হয়। বয়সের সহিত ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাটনায়

আরবী ও পারসী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়া, তিনি সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীধাম যাত্রা করেন। অদ্যাপি বারানসীক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে নবদ্বীপ, কাশী ও পুণা এখনও সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই তিন স্থানের মধ্যে কাশীতে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রচর্চ্চা উত্তমরূপে হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত সাধক, তাঁহারা সাধনের জন্য চিরকাল পীঠস্থান অন্বেষণ করেন। পীঠস্থানই সাধনের প্রকৃষ্টভূমি। সাধক স্বয়ং সেখানে থাকিয়া সাধন করেন। পাটনা তৎকালে আরবী ও পারসী শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—সুতরাং সেইখানেই ঐ ভাষাদ্বয় শিখিতে হইবে—কাশীতে বেদবেদাঙ্গ উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায়, অতএব ঐখানে ঐ সকল শাস্ত্রালোচনা করিতে হইবে বলিয়া তিনি বাগ্দেবীর সেই সেই পীঠস্থানে ঐ সকল বিষয় অধ্যয়ন করিলেন। এই সকল ঘটনাতে রামমোহন রায়ের চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তিনি পাটনায় মুসলমান শাস্ত্রে একেশ্বরবাদের যুক্তি ও প্রশংসা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন; পরে যখন কাশীধামে উপনিষদাদি পাঠ করিলেন, তখন তাহাতেও একেশ্বরবাদের যুক্তি ও প্রশংসা দেখিয়া তিনি বড়ই পুলকিত হয়েন। এত দিনে সন্দেহ দুর হইল। প্রচলিত পৌত্তলিকতায় তাঁহার অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। তিনি পৌত্তলিকতার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এই সময়ে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকা প্রকাশের সময় তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র ছিল। প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মকে এইরূপে আক্রমণ করাতে হিন্দু সমাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে লোকে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। সুযোগ পাইলে, এই সকল নিন্দুকেরা তাঁহাকে নির্য্যাতন করিত। বাহিরের লোকের ত এই ভাব, গৃহে পিতা রামকান্ত, পুত্রের এতাদৃশ ধর্ম্মমত দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রমে পিতাপুত্রে এরূপ হইল যে, রামমোহনকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে

হইল। যেকালে বাঙ্গালীর ছেলে ষোল বৎসর বয়সেও 'হেড়ে ডুগ ডুগ' 'ডাঙ্গাগুলি' 'কুস্তিকসরতে' দিন কাটাইলে কেহ নিন্দা করিত না, সে সময়ে অত অল্প বয়সে রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতের জন্য, নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহার সাধনের জন্য, সমাজের নিন্দা ও নির্য্যাতন, পিতার ক্রোধ ও গৃহত্যাগ সহ্য করা, কম সাধনানুরাগের কথা নহে। এই সকল বিপত্তিতে তিনি একদিনের জন্য সাধনক্ষেত্রে বিচলিত হয়েন নাই।

তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ দেখিয়া ভয় হয়। কিন্তু যখন মানুষ জলধি-বক্ষে পতিত হয়, তখন সেই উত্তাল তরঙ্গ তাহাকে নিমগ্ন না করিয়া, অনেক সময় ভাসাইয়া লইয়া যায়; ভয়ের স্থানে ভরসা দেয়। জীবনের ঘটনাস্রোতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আপাত দৃষ্টিতে যাহা অসুবিধা, তাহাই আবার সুন্দর সুযোগরূপে পরিণত হয়। মহাপুরুষ রাম-মোহনের গৃহত্যাগ আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও উহাতে সুমঙ্গল ঘটিয়াছিল। গৃহতাড়িত হইয়া, তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার জন্য তিব্বত দেশে উপস্থিত হয়েন। সেখানে তাঁহার জীবন নিরাপদে ছিল না। যে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য গৃহতাড়িত হয়েন; সেই স্বাধীনমত সেখানে প্রকাশ করাতে, লামাগণ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রামমোহনের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তিনি এত বিপন্ন হইয়াও স্বীয় ধর্ম্মমত প্রকাশে পশ্চাৎপদ্ হয়েন নাই। নিজের সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রাণপণ করিয়া তাহার সাধন করিতেছিলেন। এই খানেই মহতের মহত্ত্ব। পিতৃকর্ত্তৃক গৃহতাড়িত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে, চারি বৎসর অতীত হইল। তাহার পর তিনি দেশে ফিরিলেন।

রামমোহন রায় স্বদেশে থাকিয়া মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র

আলোচনা করিয়া, ঐ দুই ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানতৃষ্ণা উহাতে তৃপ্ত হইল না। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইবার মানসে তিব্বতে গমন করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিতগণের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের তত্ত্বকথা অবগত হইয়া দেশে ফিরিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্মজ্ঞানের তৃষ্ণা মিটিল না। খৃষ্টানরাজ ইংরাজের ধর্ম্মশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বকথা অবগত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যগ্র হইল। তাঁহার বয়স এই সময়ে দ্বাবিংশ বৎসর। অনেকে এ বয়সে লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করেন এবং বাল্যের সহিত বিদ্যাচর্চ্চার ব্যাপারটা অতীতের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেকে এ বয়সে বিদ্যাশিক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করেন। কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রায় সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন প্রাণপণ করিয়া তাহার সাধনা করিতে কখন পশ্চাৎপদ্ হয়েন নাই। সেই জন্য আমরা তাঁহার দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে পাঠনিরত ছাত্রের ঐকান্তিকতার সহিত ইংরাজী শিখিতে দেখিতে পাই। এত অধিক বয়সে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া, তৎকালের সৎশিক্ষা ও সদ্‌গ্রন্থের অভাব সত্ত্বেও তিনি উক্ত ভাষা সম্যক্‌রূপে অধিগত করেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী ইংরাজগণ তাঁহার ইংরাজী রচনা প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। এখনও যাঁহারা তাঁহার লেখা পাঠ করেন, তাঁহারাও তাঁহার ইংরাজী রচনা কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ইংরাজী শিখিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্র ত পাঠ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও মনের তৃপ্তি হইল না। যে ভাষায় আদি বাইবেল রচিত হয়, সেই ভাষায় বাইবেল পাঠ করিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি লাটীন ও গ্রীক ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের অন্যান্য সমস্ত কার্য্যের কথা

যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, আর একমাত্র তাঁহার এই বিবিধ ভাষা জ্ঞানের কথা আলোচনা করা যায় তবে তাহাতে তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এরূপ সাধনার ক্ষমতা না থাকিলে, আজ কি তিনি জগতের মহাজনগণের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন? রাজা রামমোহন রায় জগতে যে, একটি সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রচারের প্রয়াসী ছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বদেশ, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এবং সেই জন্য কঠোর সাধনাও করিয়াছিলেন। তিনি স্থিতিশীলতার বিরোধী ছিলেন। ক্রমোন্নতিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই জন্য কি রাজবিধি-সংস্কার, কি সমাজ-সংস্কার, আর কি শিক্ষা-সংস্কার, তৎকালীন সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল। এই জন্য দেশের ও সমাজের রক্ষণশীলগণের সহিত তাঁহাকে সতত সংগ্রাম করিতে হইত। তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রবল প্রতিরোধ উপেক্ষা ও অতিক্রম করিয়া, তিনি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় এতাবৎকাল একান্তমনে নানা ভাষা ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। পিতার সহিত মতভেদ হইলেও এতদিন পিতার পুত্র ছিলেন। সংসার প্রতিপালনের ভার, পরিবারের ভরণ-পোষণ ও সামাজিক মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার তাঁহার পিতারই ছিল। সুতরাং এতদিন তাঁহাকে সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু অতঃপর তাঁহার আর সে সুবিধা রহিল না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার দেহান্ত হইলে, তাঁহারই উপর সংসারের ভার পড়িল। তিনি এই সময়ে রংপুরে কলেক্টারিতে দেওয়ানের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ডিগ্‌বী সাহেব তখন রংপুরের কলেক্টর। ইনি একজন গুণী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন ও তাঁহার মধ্যে প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ

ছিল। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার তদনুরূপ ছিল না। ডিগ্‌বী সাহেব রামমোহনের গুণগ্রামের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। তিনি রামমোহনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রামমোহনও স্বীয় প্রভুকে গুণী ও গুণগ্রাহী দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান হয়েন। শ্রদ্ধা ও প্রীতি বন্ধুতার মূল। ডিগ্‌বী ও রামমোহনের মধ্যে তাহা ছিল। ক্রমে তাঁহারা বন্ধুতাপাশে বদ্ধ হয়েন। রংপুরের কর্ম্ম গ্রহণের কিছুকাল পরে, তাঁহার অপর দুটি ভ্রাতার কাল হয়। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহাদের বিষয় রামমোহন প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে চাকরী ও বিষয়ের আয়ে তাঁহার অবস্থা বেশ সম্পন্ন হইয়া উঠিল। তিনি নিজের আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া চাকরী ত্যাগ করিলেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে আপনার অভীষ্ট বিষয়ের সাধনায় রত হইলেন। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, পিতার ক্রোধ, অর্থকৃচ্ছ্রতা, বিদেশ ভ্রমণের ক্লেশ ও নানা প্রকার বিপদ কিছুই তাঁহাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। আবার এখন দেখিতেছি, সাংসারিক সুখ, প্রভুর সখ্য, প্রচুর অর্থাগম ও অন্যান্য নানা প্রকার সুখৈশ্বর্য্য তাঁহাকে তাঁহার সাধন ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারিল না। প্রকৃত সাধক সর্ব্বাবস্থায় এই প্রকার অবিচলিত থাকেন। দুর্ব্বলচিত্ত দুঃখে মুহ্যমান হয়, সুখে উন্মত্ত হয়—কিন্তু রামমোহন দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না। তিনি গৃহ-তাড়িত হইয়া, নানা কষ্টে পড়িয়া, যখন দেশবিদেশে শত্রুমিত্রের মধ্যে ছিলেন, তখন শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট তাঁহাকে শ্রান্ত বা ক্লান্ত করিতে পারে নাই। আবার সুখের দিনেও তিনি উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া আপনার জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। অনুকূল বায়ু আর প্রতিকূল বায়ু, যাহাই বহিতে থাকুক না—যাহাকে গম্যস্থানে যাইতে হইবে—সে কি কখন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে পারে? হৃদয়ের সঙ্কল্পকে সে ধ্রুব তারার ন্যায়, শয়নে, স্বপনে, নয়নে নয়নে রাখিয়া থাকে। ইহাই সাধকের লক্ষণ।

ভ্রাতৃদ্বয়ের দেহত্যাগের পর তিনি সমগ্র পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হওয়ায় তাঁহার আয় যথেষ্ট হইল। তখন তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত হইলেন। এ সময়েও যে তিনি তাঁহার মনোগত হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ব্বিবাদে করিতে পারিয়াছিলেন, এ কথা কেহ যেন কখন মনে করেন না। প্রাচীন ও স্থিতিশীল হিন্দু সম্প্রদায় ধর্ম্মসভা ইত্যাকার নাম দিয়া নানা সভা গঠন করিয়া তাঁহাকে নানা ছন্দে নিন্দা ও তাঁহার কুৎসা রটনা করিতেন। ইহাঁদের অত্যাচারের মাত্রা এত অধিক হইয়াছিল, যে তিনি আত্মরক্ষার জন্য সতত অস্ত্র রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এত নিন্দা ও নির্য্যাতনে তিনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। রাজা সাধনক্ষেত্রে এই সকল বিভীষিকা দর্শন করিয়া সাধনা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সাধনার ফল তাঁহার ভবিষ্যবংশীয়েরা ভোগ করিতেছেন এবং উত্তর-কালে আরও অধিকতর ভাবে করিবেন।

প্রজারঞ্জন ও রাজ্যের উন্নতিসাধন—দুটি প্রধান রাজধর্ম্ম। এই রাজধর্ম্ম পালন করিতে হইলে স্বয়ং উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নিজে অসিদ্ধ হইলে অন্যের উদ্ধার কিরূপে সম্ভব? মহারাজ রামবর্ম্ম এ কথাটি বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং সেই জন্য তিনি জীবনের প্রথম হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রাজা রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয়। ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি মহারাজ রামবর্ম্ম তদীয় রাজ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে আদর্শ রাজা ছিলেন। অশেষ ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী হইয়াও তিনি আজীবন বিবিধ বিদ্যালোচনায় তৎপর ছিলেন। নূতন জ্ঞান ও নূতন সত্য সংগ্রহের জন্য মহারাজ চিরজীবন আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে সবিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সবিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই সকল শাস্ত্রের জ্ঞানদ্বারা রাজ্যের ও প্রজাবর্গের প্রভূত মঙ্গল করিয়াছেন।

মহারাজ রামবর্ম্মের জীবনের অন্যান্য কীর্ত্তিকাহিনী বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের কথা বলা যাউক। মহারাজ নিত্য অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। প্রত্যুষে তিনি দেওয়ানের নিকট হইতে রাজ্যসংক্রান্ত বহুবিধ কাগজপত্র পাইতেন। সে সমস্ত তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া প্রয়োজনমত সংশোধন ও আজ্ঞা দান করিয়া ৭টার পূর্ব্বেই সে সকল দেওয়ানের নিকট ফিরাইয়া দিতেন। তাহার পর তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। প্রায়ই দেখা যাইত যে, এই সময়ে তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আলোচনায় কাটাইতেন। ভ্রমণ করিবার সময় তিনি বহুবিধ লতাপত্র গুল্ম সংগ্রহ করিতেন। মহারাজের স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা ছিল। তিনি আজীবন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। প্রত্যহ স্নানান্তে যথারীতি শাস্ত্রবিহিত পূজা পাঠ সমাপন করিয়া পুনরায় বেলা ১১টা হইতে অপাহ্ণ বেলা ২টা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিতেন। পরে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্যন্ত অভ্যাগতগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, সরকারী কার্য্য বিবরণী শ্রবণাদি কার্য্যে অতিবাহন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। সন্ধ্যার সময় পুনরায় সায়ং সন্ধ্যাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন। পরে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নিজ পাঠাগারে বিবিধ শাস্ত্রালোচনায় রত থাকিতেন। সংক্ষেপতঃ ইহাই তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য প্রণালী। এতদ্ ব্যতীত নৈমিত্তিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনেক সময় বিশ্রাম সুখ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইত! যাঁহারা মনে মনে ভাবেন, যে অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত ধনজনের অধীশ্বর হইলে, নিরবচ্ছিন্ন বিলাস বিভ্রমে দিন কাটানই সর্ব্বাপেক্ষা জীবনের মহত্তম ও সুখকর কর্ম্ম, তাঁহারা মহারাজ রামবর্ম্মের জীবনী অলোচনা করুন। তাঁহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরে যাইবে।

মহারাজ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই নিজ রাজ্যের জরিপ ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। রাজ্য ও রাজস্বের পরিমাণ সর্ব্ব প্রথমে জানা আশুক। তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময় পর্যন্ত রাজস্বের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে সুবন্দোবস্তের গুণে তাঁহার রাজস্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ প্রজার হিতকল্পে কৃষি ও শিল্পের সুবন্দোবস্ত করেন। মহারাজ নিজ রাজ্যে কৃশি ও শিল্পের উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অমাদের দেশের জমিদারগণের অনুকরণীয়। সাধারণতঃ কৃষক ও শিল্পিগণ স্থিতিশীল। তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে প্রকারে কৃষি ও শিল্প-কার্য্য করিয়া গিয়াছে, তাহা অসুবিধাজনক হইলেও তাহারা তাহারই অনুকরণ করিবে ; সহজে নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে বড়ই অনিচ্ছুক। রাজা বা জমিদার, সুশিক্ষিত হইলে, অন্যের অপেক্ষা অনেক অল্প চেষ্টায় আপন প্রজাগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শিল্প ও কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন ; নূতন নূতন শিল্পের ও নূতন নূতন শস্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রজাগণকে প্রোৎসাহিত করিতে পারেন। তদ্দ্বারা ধনাগমের নূতন পন্থা হয়। মহারাজ রামবর্ম্ম স্বীয় রাজ্যে টাপিওকা ও কফির চাষ প্রচলিত করিয়া প্রজাগণের নূতন জীবিকার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের ভূমিতে টাপিওকা স্বল্প বৃষ্টিতে বা বিনা বৃষ্টিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এজন্য অনেকে বলেন, এই নূতন শস্যের চাঁষ প্রচলিত করিয়া, মহারাজ রামবর্ম্ম দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তিকে স্বরাজ্য হইতে দূরে রাখিয়া গিয়াছেন।

শিল্প সম্বন্ধেও তিনি উদার নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, নিত্য পরিবর্ত্তনপ্রিয় নাগরিকগণের রুচির উৎ-কর্ষাপকর্ষ রাজা ও অন্যান্য ধনী বিলাসিগণের উপর নির্ভর করে। এজন্য তিনি স্বয়ং শিল্পী প্রজাগণের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে

ব্যবহার করিতেন ; এবং নানা উপায়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। রাজ্যের ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিগণ তদীয় আদর্শের অনুকরণ করিতেন। ইহাতে ত্রিবাঙ্কুরের দেশীয় শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। বাস্তবিক যাহারা স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে চাহেন, আর যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল কামনা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা যেন মহারাজের আদর্শ অনুকরণ করেন। দেশের ও দশের ধন-বৃদ্ধি করিতে হইলে স্বদেশজাত দ্রব্যের ও শিল্পের আদর করিতে হইবে। স্বদেশী পণ্য ও শিল্পের বহুল প্রচার হইলে প্রজার অবস্থা স্বচ্ছল হইবে, দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে। তাহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল। মহারাজ রামবর্ম্ম অর্থনীতির এই গূঢ় সত্য বিশেষরূপে অবগত ছিলেন এবং তাহা নিজ জীবনে সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ সর্ব্বপ্রকারে প্রজাগণের হিতকামনা করিতেন। প্রজা-সাধারণের জন্য, জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টির জন্য, তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আজীবন বিদ্যালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী হইতে অনেক বিষয় মালয় ভাষায় অনূদিত করিয়া, মালয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ রামবর্ম্ম নিষ্ঠাবান্ বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন। তিনি কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্রতাদির অনুষ্ঠান প্রায়ই করিতেন। বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, তিনি যে এরূপ ভাবে রাজ্যের ও প্রজার হিতসাধন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে। মহারাজের কৃচ্ছ্রসাধন দেখিলে মহাকবি কালিদাসের সহিত একবাক্যে বলিতে ইচ্ছা হয় :—

"প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎ-কল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।

ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যৎ কাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্য মুনয়স্তস্মিং স্তপস্যন্ত্যমী ॥" (ক)

পর্য্যায়ক্রমে এক্ষণে প্রথিতনামা সচিব স্যর মাধব রাও এবং স্যর সলর জঙ্গের জীবনের সাধনার অংশ বিবৃত করিতেছি। চির-বন্ধুর রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাঁদের সাধনপ্রসঙ্গ অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। অসাধারণ চরিত্রের বল এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে, রাজ্য-শাসন ও সংস্কার-কার্য্যে কৃতী হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। শাসন ও সংস্কার-কার্য্য চিরকালই দুরূহ। তীব্র প্রতিবাদ, ভীষণ বাধা এবং দুর্জ্জয় শত্রুশক্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে, কেহ প্রকৃত শাসন ও সংস্কারকার্য্যে কৃতী হইতে পারেন না। স্যর মাধব রাও ও স্যর সলর জঙ্গ উভয়েরই অসাধারণ চরিত্রবল ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছিল। সেই জন্যই তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে পদে পদে বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হয়েন নাই। এই রাজ-নীতিবিৎ মহাপুরুষদ্বয়কে কি প্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হইয়া-ছিল, তাঁহাদের দ্বারা শাসিত ও সংস্কৃত রাজ্যগুলির তৎকালীন অবস্থা পাঠ করিলে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে স্যর মাধব রাও-য়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাউক। যখন স্যর মাধব রাও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান পেশকারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তখন রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। কর্ম্মচারিগণ যথাসময়ে বেতন পাই-তেন না রাজ্যের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের জন্য সর্ব্বদা অর্থের অনটন ঘটিত। অগত্যা প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনেক সময়ই ঋণ করিতে হইত এ সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইণ্ডিয়া

(ক যেস্থলে কল্পবৃক্ষসমূহ বিদ্যমান, সেই বনস্থলীতে পূজ্যপাদ ঋষিগণ বায়ু ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন। কনকপদ্মরেণু দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ সলিলে ধর্ম্মের নিমিত্ত নিত্য স্নানাদি করিতেছেন এবং মণিময় শিলা-পৃষ্ঠে অপ্সরোগণের সন্নিধানে ধ্যান করি-তেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অপর মুনিগণ যে স্থান প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করেন. ইহাঁরা সেই স্থানে অবস্থান করিয়াও তপস্যা করিতেছেন।

গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কর পর্য্যন্ত বাকী পড়িয়াছিল। সংসারে অর্থ বল মহাবল। অর্থবলের হ্রাস হইলে, লোকবলেরও হ্রাস হয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কর্ম্মচারিগণ সময়ে বেতন না পাওয়ায় সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিতেন এবং রাজকার্য্যে তাচ্ছিল্য করিতেন। আবার যাঁহাদের ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা উৎকোচগ্রাহী ছিলেন। সুতরাং রাজা আপনার লোকজনের নিকট হইতে রীতিমত কাজ পাইতেন না। আপন কর্ম্মচারিগণ গৃহশত্রুতে পরিণত হইতে লাগিলেন। অপর দিকে বহিঃ শত্রুগণও প্রবল হইতে লাগিল। তখন রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে প্রায়ই বিদ্রোহ ঘটিত। রাজ্যের মধ্যেও প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। চৌর্য্য ও দস্যুতার সংবাদ নিত্য শুনা যাইত।

কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা রাজ্যের ধনাগম হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের ভূমি কৃষির পক্ষে অনুকূল হইলেও তখন কৃষিকার্য্য সুন্দররূপে হইত না। পথ ঘাট ভাল না থাকায় পণ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানি অল্পই হইত। আবার যাহা হইত, রাজার অর্থাভাবহেতু তাহার উপর অত্যধিক শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল। সুতরাং কি অন্তর্বাণিজ্য, আর কি বহির্বাণিজ্য কোনটির অবস্থা ভাল ছিল না। অন্যান্য দিকেও রাজ্যের অবস্থা তথৈবচ ছিল। রাজ্যের এই দুর্দ্দশার কথা যথাসময়ে তদানীন্তন গভর্ণর জেনেরল লর্ড ড্যালহৌসীর কর্ণগোচর হয়। তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিবার মানসে উতকামন্দ পর্য্যন্ত গমন করেন। এমন সময়ে মাধব রাও মধ্যবর্ত্তী হইয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে সবিশেষ অনুরোধ করেন এবং রাজ্যের আমূল সংস্কারের জন্য সাত বৎসর সময় চাহেন। সৌভাগ্যবশতঃ মন্ত্রী মাধব রাওয়ের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়।

এই সময় হইতে মাধব রাওয়ের সাধনার কঠোরতা বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। পুরাতন পদস্থ কর্ম্মচারীরা প্রায় স্থিতিশীল হইয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রায় সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের বিরোধী। মাধবরাও যেমন এক দিকে রাজ্যের মঙ্গলার্থে সর্ব্ববিষয়ে সংস্কার-প্রয়াসী, পুরাতন কর্ম্মচারিবর্গ তেমনই সংস্কার-বিদ্বেষী। মাধবরাও প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিবাদ পাইতে লাগিলেন। মাধব রাওয়ের চরিত্রবল অনন্যসাধারণ ছিল; অন্যথা এইরূপ প্রতিবাদের মধ্যে কার্য্য করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইত। গৃহসংস্কারে ত এইরূপ বিঘ্ন বাধা। অপর দিকে প্রতিবাদও কম নহে। অনেক অনুগৃহীত ব্যক্তি কোন কোন পণ্যের একচেটিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। এখন একে একে তাঁহাদের একাধিপত্য রহিত হইতে চলিল দেখিয়া, তাঁহারা চারিদিকে নূতন সচিবের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। পুরাতন পদস্থ কর্ম্মচারিগণ এখন আর পূর্ব্বের মত যথেচ্ছভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন না। অনেক স্থলে তাঁহাদের অবৈধ ধনাগমের পথ রুদ্ধ হইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহারা সকলে স্যর মাধব রাওয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপে স্বার্থপরতা ও অন্যান্য নানা দুরভিসন্ধির আরোপ করিতে লাগিলেন। স্যর মাধব রাও নিজের চরিত্র নিজে বেশ জানিতেন। নিজের বিচারে তিনি নিষ্কলঙ্ক ও রাজভক্ত ছিলেন। সুতরাং অন্যের নিন্দা বা সুখ্যাতিতে তিনি কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সেই জন্য কর্ম্মক্ষেত্ররূপ সাধনভূমিতে—তাঁহার চরিত্র আদর্শস্থানীয়। এত দিন শত্রুপক্ষ তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যে বাধা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এখন তাঁহারা অন্য উপায়ে আপনাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবার তাঁহারা ভেদ নীতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা মহারাজ ও মন্ত্রী মহোদয়ের মনোমালিন্য ঘটাইয়া দিলেন। এইরূপ অবস্থায় স্যর মাধবরাও মহারাজের কর্ম্ম করা প্রীতিকর বিবেচনা করিলেন না। অতঃপর তিনি মাসিক সহস্র

মুদ্রা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর স্যর মাধবরাও অবশিষ্ট জীবন সাহিত্য ও ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহন করিবেন এইরূপ বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে তিনি হোলকারের রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন। হোলকারের রাজকার্য্যে তিনি দুই বৎসর মাত্র ব্যাপৃত ছিলেন।

হোলকারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়া (১৮৭৫) সালে বরোদা রাজ্যের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করিলেন।

বরোদায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বড়ই বিপদ ও বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। মলহর রাও রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র ভীতি ও অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে। লোকে কেহ কাহাকেও সহজে বিশ্বাস করে না। দশ বিশ জন লোক মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিদ্রোহ, লুঠ তরাজ ও রাজশক্তিকে উপেক্ষা করাই এই সকল দলের প্রধান কর্ম্ম। প্রজা সাধারণের এই অবস্থা। প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। প্রজার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়. সুতরাং রাজার অবস্থা যে ততোধিক হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? শূন্য রাজকোষ, বিদ্রোহী ও অবিশ্বাসী প্রজা লইয়া রাজ্যের সুশাসন অসম্ভব হইয়াছিল। সুশাসন ও সংস্কার কার্য্যের জন্য অর্থের আবশ্যক। অন্যথা সুশাসন ও সংস্কার দুরূহ হইয়া উঠে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কর্ম্মচারিগণ অল্প বেতনভোগী। সেই অল্প বেতনও আবার বহু দিন হইতে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং তাহারা যে উৎকোচগ্রাহী ও অত্যাচারী হইবে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এক্ষণে এই অবস্থার সংস্কার করিতে হইলে,কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগকে বাকী বেতনাদি দিয়া বিদায় করা আবশ্যক। তাহার পর উৎকোচাদি

নিবারণ করিতে হইলে, কর্ম্মচারি-সাধারণের কর্ত্তব্য কার্য্যের দায়িত্বের অনুপাতে বেতন বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক এবং বর্দ্ধিত হারের বেতন যথাসময়ে দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর, যে সকল কুসীদগ্রাহী লোক ঋণ দিয়া রাজাকে বাধ্য রাখিয়াছে এবং সেই জন্য বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধের অপব্যবহার করে, তাহাদের ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। এখন দেখা যাইতেছে এ সকল কার্য্যই অর্থসাপেক্ষ। কিন্তু এই সকল কার্য্যের জন্য তখন রাজকোষে অর্থ ছিল না। তখন যেরূপ আয় ছিল, তাহাতে রাজ্যের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় কোনরূপে চলিত। অথচ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সংস্কার আবশ্যক। আর সংস্কারের জন্য অর্থের আবশ্যক। কিন্তু অর্থ আসে কোথা হইতে? রাজ্যের সুশাসন, সংস্কার ও রাজস্ব বৃদ্ধির প্রশ্ন প্রথম হইতেই স্যর মাধব রাওকে সাতিশয় চিন্তিত করিয়াছিল। রাজ্যের সুশাসন ও সংস্কার-কার্য্য রাজস্বের উপর নির্ভর করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে কি প্রকৃষ্ট উপায়ে সেই রাজস্ব-বৃদ্ধি হয়, তাহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। গাইকোয়ারের রাজ্যের রাজস্ব-প্রণালী নানা দোষে দুষ্ট ছিল। রাজস্ব-প্রণালীর সংস্কারের জন্য নূতন দেওয়ানকে বিশিষ্টরূপ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। রাজস্বের উন্নতির জন্য স্যর মাধবরাওকে যে কি পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে, বরোদার সেই সময়ের রাজস্ব প্রণালীর সম্বন্ধে দু চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

বরোদায় সর্দ্দার উপাধিধারী কতকগুলি অভিজাতের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। ইহারা রাজ-সরকারের নিকট হইতে কয়েক বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ দিবার সর্ত্তে জমিদারী ইজারা লইতেন। সর্দ্দারগণ আবার ঐ সকল জমিদারী সওকার নামক এক শ্রেণীর লোকের হস্তে পত্তনী দিতেন। ইহারা কেবল সর্দ্দারের প্রাপ্য টাকা দিবার জন্যই বাধ্য থাকিতেন, অন্য কোন নিয়মের অধীন হইয়া

চলিতেন না। নানা হিসাবে টাকা আদায় করিবার জন্য সওকারগণ প্রজাপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাস্তবিক, ঠিকাদারী বন্দোবস্তে কেহ কাহারই প্রতি তাকায় না। প্রত্যেকেই আপন আপন দেয় ও প্রাপ্য লইয়াই ব্যস্ত থাকে। রাজা, সর্দ্দার সওকার বা প্রজার সুবিধা অসুবিধা বুঝিতেন না। তিনি সর্দ্দারের নিকট হইতে আপন প্রাপ্য টাকা পাইলেই নিশ্চিন্ত; সর্দ্দার আবার সেইরূপ সওকারের নিকট আপন প্রাপ্য টাকা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চাহেন! রাজা বা সর্দ্দার কাহাকেও সাক্ষাৎভাবে প্রজার সহিত কার্য্য করিতে হইত না; সুতরাং প্রজার সুখ দুঃখে তাঁহারা উদাসীন থাকিতে পারিতেন। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি বা সুবৃষ্টিজনিত প্রজার ক্ষতি বৃদ্ধির কথা তাঁহারা জানিতে চাহিতেন না। তাঁহারা আপন আপন প্রাপ্য টাকা চাহেন। এ দিকে সওকারকে ঐ টাকা এক একটি করিয়া প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতে হইত। সওকার আদায়ের টাকা হইতে নিজের লাভটি রাখিয়া তবে সর্দ্দারকে দিতেন। ন্যায্য লাভের কথা ছাড়া সওকার ভাবিতেন যে, কি জানি, ঠিকা পুনরায় পাইব কি না; সুতরাং এই কয় বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায়, তাহাই ভাল। তিনি এই ভাবিয়া প্রজার নিকট বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্থ শোষণ করিতেন। ইহাতে প্রজা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইত; এমন কি অনেক সময় উৎখাত হইত। সুতরাং এই অবস্থায় প্রজার দুঃখ কখনও ঘুচিত না। রাজার মঙ্গলে যেমন প্রজার মঙ্গল, তেমনি প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। অতএব যে রাজ্যে প্রজা দুঃখে দিন যাপন করে, সে রাজ্যের শ্রেয়ঃ কোথায়?

মাধবরাও সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝিলেন। কুশলী অস্ত্রচিকিৎসক যেমন পীড়িত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া কোথায় ব্রণস্থান এবং কোথায় ছুরিকাঘাত

করিতে হইবে জানিতে পারেন, মাধবরাও তেমনই রাজ্যের ব্রণস্থান কোথায় এবং কোথায় সংস্কারকের তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রয়োগ করিতে হইবে জানিতে পারিলেন। সর্দ্দারগণের সহিত রাজস্বের ঠিকাদারী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিতে না পারিলে, রাজ্যের কল্যাণ নাই. এ কথা তিনি উত্তম-রূপে বুঝিলেন। কিন্তু সর্দ্দারগণকে বিপর্য্যস্ত করা বড়ই সুকঠিন কার্য্য। তাঁহারা রাজ্যের অভিজাত। তাঁহাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সওকারগণ তাঁহাদের সহায়ক। মাধবরাও ইঁহাদের হস্ত হইতে রাজস্ব সংগ্রহের ভার উঠাইয়া লইয়া. তৎসঙ্গে তাঁহাদের ধনাগমের পথ রুদ্ধ করিতেছেন. এ কথা যখন সকলে জানিতে পারিলেন, তখন চারিদিক হইতে ভীষণ প্রতিবাদ হইতে লাগিল। সর্দ্দারগণ. কুটবুদ্ধি ব্যবহারবিশারদগণের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা নানা-প্রকার আইনের তর্ক উঠাইতে লাগিলেন। স্যর মাধবরাও ব্যবহার-জীব না হইয়াও ব্যবহারশাস্ত্রের কূটতত্ত্ব সকল অবগত ছিলেন। তাহার পর তাঁহার স্বাভাবিক কুশাগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে কণ্টক দ্বারা কণ্টকোদ্ধারের উপায় করিলেন। সর্দ্দারগণ যে সকল দলিলাদির সাহায্যে আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে উদ্যত ছিলেন. তাঁহারা সেই সকল দলিলের সর্ত্ত পূরণ না করাতে নিজের জালে নিজেরা পড়িলেন। তাঁহাদের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যে সকল গ্রামের বন্দোবস্ত হইত, তাহার প্রধান সর্ত্ত এই যে তাঁহারা প্রতি বৎসর নিয়-মিত সময়ে দেয় টাকা পরিশোধ করিবেন। কিন্তু এই সময়ে হিসাব পরীক্ষা করিয়া স্যর মাধবরাও দেখিলেন যে, অধিকাংশ সর্দ্দারের নিকট কোন না কোন হিসাবে রাজস্ব অনাদায় রহিয়াছে। এইরূপ অনাদায় টাকার পরিমাণও অনেক। এই সব দেখিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে, যে যে সর্দ্দারের নিকট রাজস্ব বাকী আছে, যদি নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে টাকা না দিতে পারেন, তবে তাঁহারা স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন।

সর্দ্দারগণ এত দিন বেশ সুখে কাটাইতেছিলেন—তাঁহাদের ব্যয়ের কোন সীমা ছিল না—এমন কি তাঁহারা রাজার প্রাপ্য অর্থ পর্য্যন্ত খরচ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট যে সঞ্চিত অর্থ ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাঁহারা নূতন দেওয়ানের এইরূপ ঘোষণায় বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। অনেকেই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দেয় টাকা দিতে পারিলেন না। সচিবপ্রবর স্যর মাধবরাও যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। সর্দ্দারগণ শেষে পরাজিত হইলেন। ক্রমে সওকারগণও ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। সর্দ্দার ও সওকারদিগের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয়, তাঁহাদিগকে কাশী প্রভৃতি স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপিত করেন।

স্যর মাধবরাও অতঃপর আপনার মনোমত সংস্কার কার্য্য করিতে লাগিলেন। শাসন ও রাজস্ব উভয় বিভাগেই তিনি বিবিধ হিতকর সংস্কার করেন। সর্দ্দার ও সওকারদিগের হস্ত হইতে রাজস্ব সংগ্রহের ভার উঠাইয়া লইয়া সঙ্গত উপায়ে ও সংস্কৃত পদ্ধতিতে রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ এই দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কেবল আয় বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হইলে, করভার বৃদ্ধির ভয় থাকে ও অন্যান্য প্রকারে প্রজা পীড়নের আশঙ্কা থাকে। সেই জন্য রাজস্বতত্ত্ববিৎ সচিব ব্যয় সঙ্কোচ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন। তিনি বরোদা রাজ্যের অনেক অপব্যয় রহিত করেন। তন্মধ্যে হাব্‌সী সৈন্যদলকে বিদায় করা একটি প্রধান। ইহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল—তাহার উপর ইহাদের অত্যাচারও কম ছিল না। এই সকল কারণে তিনি এই সৈন্যদলকে রক্ষা করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই।

সচিব মাধবরাও রাজ্যের উন্নতিকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেওয়ানের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অবিরাম চেষ্টা দ্বারা

এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের কৃপায় তিনি সাধনভূমিতে বিঘ্নমুক্ত হয়েন। তিনি যে যে কার্য্যের সাধনায় এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেই সেই কার্য্যে তাঁহার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা হইতে লাগিল। স্যর মাধবরাওয়ের কর্ম্মশীল জীবনে রাজনীতিক্ষেত্রে সাধনার প্রসঙ্গ এই খানেই এক প্রকার শেষ হয়।

স্যর সলরজঙ্গ ২৪ বৎসর বয়সে নিজামের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পাশ্চাত্য জ্ঞানসম্পদে হিন্দুসচিব মাধবরাওয়ের ন্যায় স্যর সলরজঙ্গ সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে রাজকার্য্যে সমধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের অল্পতা জন্য তাঁহাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি ঈশ্বরদত্ত ক্ষুরধার বুদ্ধি, অনবদ্য স্বাস্থ্য ও দৃঢ়চিত্ত লইয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

স্যর সলরজঙ্গ মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অল্পকাল পরে দেখিলেন, রাজ্যের মধ্যে নানা গোলযোগ। রাজকোষ শূন্য। নিজামের বহুমূল্য রত্নরাজি ঋণের জন্য বিলাতে আবদ্ধ। এই সময়ে নিজামের তিন কোটি টাকা ঋণ। সৈনিক কর্ম্মচারিগণের বাকী বেতনের জন্য অনেক গ্রামের রাজস্ব তাঁহাদের নিকট আবদ্ধ। নিজামের প্রতিপত্তি কোথাও নাই। কেহ তাঁহাকে ঋণ দিতে সাহস করেন না। এদিকে রাজ্যের যাহা আয় ছিল, তাহাতে ব্যয় সঙ্কুলানই হইত না। ব্যয়ও যে নির্দ্ধারিত বা ন্যায্য ছিল, তাহা নহে। নিজামের অনেক কুপোষ্য ছিল। তাঁহাকে অনেক গলগ্রহের ভার বহন করিতে হইত।

সলরজঙ্গ রাজ্যের অবস্থা সবিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দেখিলেন, রাজ্যের মধ্যে কতকগুলা অকর্ম্মণ্য অথচ অত্যাচারী আরবী, পাঠান ও রোহিলা সৈন্য রহিয়াছে। যুদ্ধকার্য্যে

ইহাদের সামর্থ্য না থাকিলেও অত্যাচারে ইহারা বিলক্ষণ অভ্যস্ত। ইহাদের অনেকে সাক্ষাৎভাবে নিজামের অধীন থাকিয়া বেতন পাইত এবং অপরাপর অনেকে জায়গীরদার ও তালুকদারদিগের অধীন থাকিত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইঁহাদের এই সকল সৈন্য দ্বারা নিজামের সাহায্য করিবার কথা। স্যর সলরজঙ্গ দেখিলেন, ইহাদের বেতনা-দিতে বহু ব্যয়। অথচ ইহাদের দ্বারা রাজ্যের উপকারের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি ইহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন এবং এতদর্থে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। যাহারা সাক্ষাৎভাবে নিজামের অধীন ছিল, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না; অধিকন্তু প্রত্যেক জায়গীরদার ও তালুকদারের উপর ঐ মর্ম্মে আদেশ দিলেন। এই সকল সৈনিকদিগের কর্ম্মচ্যুতিতে রাজ্যের ত্রিবিধ মঙ্গল হইল। প্রথমতঃ ইহাদের বেতনের জন্য যে অর্থব্যয় হইত, তাহা বন্ধ হইল। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের অনেকের নিকট বাকী বেতন ও অন্যান্য নানা কারণে অনেক গ্রামের রাজস্ব আবদ্ধ ছিল—তাহার উদ্ধার হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই উপায়ে তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি করেন। তৃতীয়তঃ প্রজাসাধারণ ও নাগরিকগণকে ইহাদের পাশবিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করায় রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল।

ইহার পর স্যর সলরজঙ্গ রাজ্যের জরিপ করিয়া হায়দ্রাবাদকে বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য যে ঠিকাদারী বন্দোবস্ত ছিল, তাহা উঠাইয়া দিলেন। তালুকদারগণ নানা প্রকারে প্রজাপীড়ন করিতেন; এজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ হইত। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের নামে আরও গুরুতর অভিযোগ এই ছিল যে, তাঁহারা রাজস্ব আদায় করিয়া তাহার চতুর্থাংশ, কোথাও বা অর্দ্ধেক,

পারিশ্রমিক হিসাবে পূর্ব্বেই কাটিয়া লইতেন। ইহাতে রাজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইত। এই সকল কারণে মন্ত্রী সলরজঙ্গ তাঁহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিলেন। এক্ষণে তিনি প্রজাহিতার্থে নূতন নিয়ম করিলেন। প্রজার দেয় খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি শস্যের পরিবর্ত্তে নগদ টাকায় খাজনা লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। প্রজার স্বত্বের যদি স্থায়িত্ব না থাকে, তাহার দেয় করের যদি কোন নির্দ্ধারণ না থাকে, তবে সে কোন্ লাভের আশায় নিজ আবাদী জমির উন্নতি করিবে? সে যদি দেখে, তাহার চেষ্টার ফলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সহিত খাজনা বৃদ্ধি হয়, আর বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে অপারগ হইলে বা অস্বীকার করিলে, জমি হস্তান্তরিত হয়, তবে কোন্ লাভের প্রত্যাশায় দেহপাত করিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবে? কিন্তু সে যদি এরূপ অভয় পায় ও বিশ্বাস করে যে, জমি ভাল করিলে তাহাতে শস্য প্রচুর হইলেও রাজা খাজনা বৃদ্ধি করিবেন না, তবে না সে, লাভের আশায় দেহপাত করিয়া, জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করে। প্রজার দ্বারাই ঊষর ভূমি উর্ব্বর হয়, দেশ শস্যশ্যামলা হয়। প্রজা সুখী হইলে রাজা সুখী হয়েন। প্রজার ধনবৃদ্ধি হইলে রাজার ধনবৃদ্ধি হয়। যে রাজ্যের প্রজার অবস্থা সচ্ছল সে রাজ্যে রাজার বহুবিধ ধনাগমের পথ আছে। প্রজার অবস্থা সচ্ছল হইলে, রাজা প্রত্যক্ষ ও গৌণভাবে নানাপ্রকার শুল্ক দ্বারা রাজকোষ পূর্ণ করিতে পারেন। স্যর সলরজঙ্গ রাজস্বতত্ত্বের এই গূঢ়তত্ত্ব অবগত ছিলেন—ইহার উপকারিতায় আস্থাবান ছিলেন—সেই জন্য তিনি নানা অসুবিধা ও প্রতিবাদের মধ্যে ঐ প্রকার সঙ্গত ও সুন্দর রাজস্ব প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। এখানে এ কথা বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের জন্য বঙ্গ-দেশের প্রজাসাধারণের অবস্থা ভাল।

স্যর সলরজঙ্গের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের আর্থিক অবস্থার ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। এখন তিনি একটি মধ্যবর্ত্তী ধনাগারের প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজ্যের আয় ব্যয় তথা হইতে হইত এবং সমস্ত জমা খরচের হিসাব নিকাশ সেখানে হইত। ইহাতে দেখা যায়, স্যর সলরজঙ্গের সংস্কৃত রাজস্ব পদ্ধতিতে রাজ্যের ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হইতে লাগিল। ধনাগারে অল্পে অল্পে ধন সঞ্চিত হইতে লাগিল।

কথিত আছে ঃ—

"নরপতি-হিতকর্ত্তা দ্বেষ্যতাং যাতি লোকে,
জনপদহিতকর্ত্তা ত্যজ্যতে পার্থিবেন।
ইতি মহতি বিরোধে বিদ্যমানে সমানে,
নৃপতি-জনপদানাং দুর্লভঃ কার্য্যকর্ত্তা "

অর্থাৎ রাজা ও প্রজা উভয়কে সন্তুষ্ট করিয়া কার্য্য করা দুরূহ; রাজার ভাল করিতে গেলে, প্রজা বিরূপ হয়. আবার প্রজার হিতার্থে কার্য্য করিতে গেলে রাজা রুষ্ট হয়েন; সুতরাং রাজা ও প্রজা উভয়েরই হিতসাধন করিতে পারেন, এমন লোক দুর্লভ। কথাটি খুব সত্য। কিন্তু যিনি রাজা এবং প্রজা উভয়েরই বিরাগভাজন হইয়াও কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে দেশের কল্যাণ হৃদয়ে পোষণ করিয়া, ভগবানের কৃপায় নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তেমন লোক জগতে আরও দুর্লভ।

স্যর সলর জঙ্গ এইরূপ দুর্লভ ব্যক্তি ছিলেন। নিজাম আফজল উল দৌল্লা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। মন্ত্রী মহোদয়ের কার্য্যকলাপ এবং তাঁহার গতিবিধি নিজাম সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্তে দেখিতেন। রাজ্যের প্রধান সচিব হইলেও স্যর সলরজঙ্গ নিজামের নজরবন্দী থাকিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ নিজামের বিনা

অনুমতিতে তিনি কুত্রাপি গতায়াত করিতে পারিতেন না। নগরের উপকণ্ঠে তাঁহার পুষ্পবাটিকায় বন্ধুবান্ধব লইয়া এক দিন আমোদ প্রমোদে সায়াহ্ন অতিবাহিত করিবার বাসনা হইলে, তাহার জন্যও সচিবকে নিজামের অনুমতি লইতে হইত। কোন দিন ইংরাজ সৈনিকের কুচ কাওয়াজ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে প্রভুর আজ্ঞা লইতে হইত। নিজাম তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন না। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে এরূপ ভাব অতিশয় শোচনীয়। স্যর সলর জঙ্গকে পদচ্যুত করিবার জন্য একবার একটি বিষম ষড়যন্ত্র হয়। ষড়যন্ত্রকারিগণ নিজামকে এরূপ সংবাদ দেয় যে, রেসিডেণ্ট সাহেব মন্ত্রী মহোদয়ের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। নিজাম সলরজঙ্গের উপর এতই রুষ্ট ছিলেন যে, তিনি এ সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া, একবারে রেসিডেণ্ট সাহেবের কুঠীতে গিয়া কথোপকথনচ্ছলে বলেন যে,—রেসিডেণ্ট সাহেব সচিবকে কর্ম্মচ্যুত করিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি তাহার অনুমোদন করিবেন। রেসিডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বাপর সলরজঙ্গের পরম মিত্র ছিলেন। তিনি নিজামের মুখে এই কথা শুনিয়া, মনের ভাব গোপন করিয়া, মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

যে রাজার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করিয়া তিনি পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাঁহার ত মনের ভাব এই প্রকার। এক্ষণে দেখা যাউক তিনি প্রজাবর্গের কিরূপ অনুরাগভাজন ছিলেন।

স্যার সলরজঙ্গ চিরকাল ইংরাজের অকৃত্রিম মিত্র। সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী ইংরাজরাজের মিত্রতায় যে হায়দ্রাবাদের পরম মঙ্গল, ইহা তিনি বিশিষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ যখন ভারতের চারিদিকে বিদ্রোহানল জ্বলিতেছিল, যখন এক রাজার পর অপর রাজা বিদ্রোহী দলের সহিত যোগ দিতেছিল—

যখন একদল সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া অপর দলকে বিদ্রোহ ব্যাপারে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছিল—যখন বিদ্রোহ বহ্নিতে ইংরাজ নরনারী ও অসহায় বালকবালিকাগণ দাবানল-বেষ্টিত মৃগযূথের ন্যায় ভীতিবিহ্বল হইয়া দিনযাপন করিতেছিলেন, তখন শত্রু মিত্র সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া নিজামের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। নিজামের প্রজাবর্গ "ফিরাঙ্গি" দিগকে হিন্দুস্থান হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে—নিজামের আজ্ঞামাত্র তাহারা অপেক্ষা করিতেছে—ইঙ্গিতে তাহারা নিজামের অনুমতি পাইলে, বিদ্রোহী দলের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিসবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করে- এরূপ উৎকণ্ঠা ও উন্মত্ততার সময় একমাত্র দূরদর্শী রাজনীতিক স্যর সলরজঙ্গের দৃঢ়চিত্ততার গুণে সকল দিক রক্ষা হইয়াছিল। তিনি নিজামের সৈন্য ও প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহব্যাপারে যোগ দিতে নিরস্ত করিলেন। সৈন্যগণ ও প্রজাগণ নিরস্ত হইল। তিনি কৌশলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত নিবারণ করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু তৎকালে মাঝে মাঝে সে অগ্নির অল্পাধিক উৎপাত দেখা গিয়াছিল। ইহার নিদর্শন স্বরূপ দুইবার তাঁহার জীবন শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় দুইবারই তিনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৯ খৃঃ অঃ হায়দ্রাবাদের লোকেরা যথারীতি চক্রান্ত করিয়া স্যর সলরজঙ্গকে বধ করিবার জন্য উদ্যোগ করে। এক দিন সচিব মহোদয় রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে নিজামের প্রাসাদ হইতে যখন ফিরিতেছিলেন, তখন জাহাঙ্গীর খাঁ নামক একজন লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোড়ে। সৌভাগ্য-বশতঃ দুর্ব্বৃত্তের সন্ধান ব্যর্থ হয়। বন্দুকের সন্ধান ব্যর্থ হইল দেখিয়া, সে তরবারি হস্তে সলরজঙ্গের বধোদ্দেশে ধাবিত হইল। কিন্তু সে

বারও সে কিছু করিতে পারিল না। সলরজঙ্গের পার্শ্বস্থ অপরাপর লোকজন পাষণ্ড জাহাঙ্গীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

এই দুর্ঘটনার বহুদিন পরে ১৮৬৮ সালে স্যর সলরজঙ্গকে হত্যা করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা হয়। একদিন নিজামের প্রাসাদে দরবারে যাইবার সময় পথিমধ্যে জনৈক দুরাত্মা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দুইবার বন্দুক আওয়াজ করে। দুইবারই পাষণ্ডের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। পরে সে স্বয়ং ধৃত হইয়া বিচারার্থ নিজামের সম্মুখে নীত হয়। নিজাম তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। স্যর সলরজঙ্গ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার পরমশত্রুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করাইয়া কারাদণ্ডের জন্য নিজামকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিজাম দুর্বৃত্তের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন নাই। স্যর সলরজঙ্গ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আপনার সুখ স্বাস্থ্য এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজার প্রীতির পাত্র হইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে প্রজাহিতার্থে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের পূজার পাত্র হইতে পারেন নাই, অথচ তিনি কি রাজা কি প্রজা উভয়েরই সতত মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় স্থিরচিত্তে যে মহাপুরুষ কর্ত্তব্যের পথে অবিচলিত থাকিতে পারেন, তিনি অসাধারণ লোক। তাঁহাব সদৃশ ব্যক্তি যে নিতান্ত দুর্লভ তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

১৮৬৯ খৃঃ অঃ বৃদ্ধ নিজাম আফজল উল দৌল্লার মৃত্যুর পর নবীন নিজাম সিংহাসনে আরূঢ় হন। কিন্তু তিনি তৎকালে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন ; এজন্য গভর্ণর জেনারল বাহাদুর স্যর সলরজঙ্গ এবং সামসুল্ মুল্ক আমির-ই কাবরকে নবীন নিজামের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। স্যর সলরজঙ্গ পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যমের সহিত রাজ্যের হিতসাধনে রত রহিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। পরে ১৮৭৫ খৃঃ অঃ আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড—(তখন প্রিন্স অব ওয়েল্স

নামে খ্যাত ছিলেন) ভারত ভ্রমণে আসেন। এই সময় স্যর সলরজঙ্গ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহারই সাদর আহ্বানে ১৮৭৬ সালে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানেও তিনি বিবিধ উপায়ে নিজাম ও তাঁহার রাজ্যের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি স্বদেশে কি বিদেশে, তিনি কায়মনোবাক্যে হায়দ্রাবাদের হিতসাধন করিয়াছিলেন। রাজনীতিজ্ঞ স্যর সলরজঙ্গের সাধন-প্রসঙ্গ চিরকাল মনোজ্ঞ এবং হিতকর বলিয়া পরিগণিত হইবে।

নৃপতি বা নৃপকল্প ব্যক্তি, ধনী বা অভিজাত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন হইলে, যেমন ধন, মান, বিষয় বিভব বা বিলাস বিভ্রম কিছুই তাঁহার ঈপ্সিত বস্তু লাভের পথে অন্তরায় হইতে পারে না— মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি যেমন কোনরূপে তাঁহাকে সাধনার আসন হইতে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইলে সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে, প্রতিজ্ঞা অটল থাকিলে—সমাজের দরিদ্র দুঃস্থ নগণ্য ব্যক্তিও দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অনটন, অর্দ্ধাশন বা অনশন অথবা রোগ, শোক—যাহা কিছু দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক, সমস্তই অতিক্রম করিয়া সাধনভূমিতে নির্ভীকচিত্তে থাকিতে পারেন। ধনবল বা জনবল না থাকিলেও, তিনি স্বকীয় চরিত্রের বলে এবং প্রতিজ্ঞার বলে, আত্মশক্তি দ্বারা সর্ব্ব প্রকার প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি প্রতিকূল শক্তিসমূহের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইবেন সেও স্বীকার, তথাপি সাধনভূমি ত্যাগ করিবেন না। দুঃখ দারিদ্র্যের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভীতি-বিহ্বল হয়েন না। তিনি কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষতা প্রকাশ করেন না। বিত্তবিহীন হইলেও তিনি শক্তিবিহীন নহেন। কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি বীরপুরুষ বলিয়া চিরকাল বরণীয়।

বঙ্গের গৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্রেণীর বীরপুরুষদের মধ্যে একজন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন কর্ম্মযোগী ছিলেন। বিদ্যা-মন্দিরে তাঁহার কর্ম্মযোগের সাধনার সূচনা হয়। বাল্যে যখন বিদ্যা-মন্দিরে বাগ্‌দেবীর সাধনায় রত ছিলেন, তখন দারিদ্র্য নানাভাবে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়াছিল। নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। কিন্তু বালক ঈশ্বরচন্দ্র স্বীয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে, সে সকলকে পরাভূত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রজীবনে যে প্রকার কষ্ট ও সহিষ্ণুতার সহিত নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া, বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। একদিকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, অপরদিকে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সম্যক্ চেষ্টা, ইহা বৈদেশিক অনেক মহাত্মার জীবনে দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিণ-দেশীয় যুক্তরাজ্যের প্রথিত-নামা দেশপতি মহাত্মা গারফিল্ডের জীবনে এই প্রকার ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। পুরাকালে আমাদের দেশেও অবশ্য সেরূপ উদাহরণ বিরল ছিল না। উদ্দালক ও উপমন্যুর কথা এখন পৌরাণিক কাহি-নীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন দেশে দৈহিক পরিশ্রমের মর্য্যাদা নাই। কায়িক শ্রমের বিনিময়ে মানসিক উন্নতি লাভের প্রবৃত্তি, প্রশংসার কথা। যে দিন লোকের সে প্রবৃত্তি হইবে, সে দিন হইতে আমাদের দেশের প্রকৃত মঙ্গলের সূত্রপাত হইবে। তখন শ্রমজীবি-গণের মধ্যে জ্ঞানের আলোক সঞ্চরিত হইবে। যাহা হউক সে ত দূরের কথা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র যখন প্রথমে কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া, পরে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। তখনকার সময়ে কলিকাতায় বাস, তাহার উপর স্বহস্তে তিন চারি জনের রন্ধনাদি কার্য্য এবং পরে ক্লান্ত শরীরে রাত্রি

জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করা ও প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যে কত দূর কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

তখন কলিকাতা সহর কেমন ছিল তৎসম্বন্ধে দুচারি কথা বলিলেই কলিকাতা বাসের সুখের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। কলিকাতা তখন এমন সৌধমালায় শোভিত ছিল না। রাত্রিতে আলোকরাজিতে শোভিত হইত না। সৌদামিনী চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া কমলার আলয় সুন্দর সৌধশ্রেণীর শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে, এ কথা তখন কেহ শুনে নাই। জাহ্নবীর পূত জলই লোকে জানিত, পল্‌তায় যে তাহা পরিষ্কৃত হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বা গৃহাভ্যন্তরে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা কেহ ভাবিতে পারিত না। পরিষ্কৃত কলের জল, গ্যাসের ও বিদ্যুতের আলোক ত অপেক্ষাকৃত বিলাসের কথা। কিন্তু আজ কাল আমরা যে গুলিকে স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি, সে গুলির পর্য্যন্ত তখন অভাব ছিল। পরিষ্কৃত পয়ঃপ্রণালী বা আবর্জ্জনাশূন্য পথঘাট তখন ছিল না। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাহায্যে এখন মিউনিসিপালিটী কলিকাতার প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। তখন সে সব প্রায় কিছুই ছিল না। প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে পঙ্কিল পূতিগন্ধময় পয়ঃপ্রণালী সকল অনাবৃত থাকিত। নগরের অধিকাংশ আবর্জ্জনা, শেষে সেইখানে পচিত এবং সে গুলি হইতে সতত ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ নির্গত হইত। পথের মধ্যে স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত। রাত্রিতে পথে কদাচিৎ আলোক দেওয়া হইত—যদিও বা কোথাও দেওয়া হইত, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ, তাহাতে কেবল অন্ধকার ঘনীভূত হইত মাত্র। বাটীর বাহিরের পথ ঘাটের ত এই দশা। ভিতরে, দ্বিতল বা ত্রিতল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণ হইতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা শূন্যোদক গভীর কূপ

বলিয়া বোধ হইত। এই সকল বাটীর অধিকাংশ ভাড়াটিয়া দ্বারা পূর্ণ থাকিত। পারাবত বাসস্থানের ন্যায় প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে লোক। উপরের লোকেরা তাহাদের আবর্জ্জনাদি সুবিধা পাইলে নিম্নে প্রায়ই নিক্ষেপ করিত। সুতরাং নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠবাসীদিগের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এ সকল যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা ছিল, যে বাটির পায়খানা নিম্নতলে থাকিত। হয়ত তাহারই পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পাকশালা, তাহারই সম্মুখে বাসের ঘর। সেই ঘরের ভিতরের চূণ-কাম কোথাও লোণা লাগিয়া খসিয়া পড়িয়াছে—কোথাও বা তাহার অংশবিশেষে তাম্বুলরাগরক্ত নিষ্ঠীবনে রঞ্জিত হইয়াছে। ঘরের আস-বাবের মধ্যে সুন্দরবনজাত সুলভ কাষ্ঠের দুই একখানি তক্তাপোষ। তাহার উপর জীর্ণ ছিন্ন একখানি মাদুর বিস্তৃত। ধূলি সংযোগে তাহা হয় ত তক্তপোষের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে লিপ্ত হইয়া আছে। তক্ত-পোষের নিম্নে অন্ধকার প্রদেশে তৈলপায়িকাগণ পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে। এ সকল ছাড়া গুপ্ত কবির

"রেতে মশা, দিনে মাছি"

ত ছিলই। সংক্ষেপতঃ এখনকার কলিকাতা ও তখনকার কলিকাতায় স্বর্গ নরক প্রভেদ ছিল। বিশেষতঃ গরিবের পক্ষে।

বঙ্গের পল্লীগ্রামের সুশ্যাম তৃণশস্যশোভিত ও বৃক্ষলতা-গুল্ম-পরি-বেষ্টিত মাঠ ঘাট ত্যাগ করিয়া, মুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া, রুদ্ধশ্বাসে কলি-কাতার পূতিগন্ধময় প্রকোষ্ঠে বাস করা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা বলাই বাহুল্য। বালক ঈশ্বরচন্দ্র স্নেহময়ী জননী ভগবতী দেবী, প্রিয় জন্ম-ভূমি বীরসিংহ ও শৈশব-সহচরগণকে ছাড়িয়া, পিতার সহিত কলি-কাতায় আসিয়া, ঐরূপ কোন প্রকোষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার পিতার দারিদ্র্যের সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এক সময়ে আহারাভাবে

তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একখানি পিত্তলের ভোজনপাত্র বন্ধক বা বিক্রয়ের জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইহার পর অবশ্য তাঁহার অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছিল অর্থাৎ মাসিক দুই টাকা হইতে দশ টাকা আয় হয়। এই সময়ে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থে কলিকাতায় আনেন। পুত্রের সুশিক্ষার জন্য পিতার আগ্রহ ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়। কথিত আছে, মাতৃদোষে পুত্র রুগ্নতা এবং পিতৃদোষে মূর্খতা প্রাপ্ত হয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে দরিদ্র ঠাকুরদাসের গুণের উপর ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালাভ বহুলপরিমাণে নির্ভর করিয়াছিল। আর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রে ঠাকুরদাসের পুণ্যলক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছিল। শাস্ত্রকার বলেন "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তখন সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদিগের বেতন লাগিত না। হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠের প্রথা ছিল। কোনরূপে আহারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, কলিকাতায় থাকিয়া পুত্রের সুশিক্ষা হইবে, এই ভরসায় তিনি পুত্রকে কলিকাতায় আনিতে সাহসী হয়েন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের এই সামান্য আহারের সংস্থানও সকল সময় ভালরূপে হইত না। বিদ্যাসাগরের চরিতাখ্যায়কগণ বলেন, এই সময়ে তাঁহাদের এমন দিনও গিয়াছে যে, ঝালের মৎস্য ঝোলে, পরে তাহা অম্লে পাক করিয়া, তিন সন্ধ্যা ব্যঞ্জন সুস্বাদ করিতে হইত। কলিকাতায় আসার কিছুকাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বহস্তে দুবেলা পাক করিতে হয়। তাঁহার কলিকাতা আগমনের পর, ক্রমে ক্রমে অপর ভাইগুলি কলিকাতায় শিক্ষার্থ আনীত হয়েন। ইহাঁদের সকলের আহারাদি তাঁহাকেই প্রস্তুত করিতে হইত। ভাইগুলি আসায় অন্যান্য গৃহকার্য্য যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। প্রাতঃ ও সায়াহ্ন কাল রন্ধনাদি নানা-

প্রকার গৃহকার্য্যে অতিবাহিত হইত। দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিদ্যালয়ে থাকিতে হইত। সুতরাং দৈনিক পাঠাভ্যাসের জন্য তাঁহাকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। একে এই উৎকট পরিশ্রম, তাহার উপর অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস; সুতরাং অনেক সময় তাঁহার পীড়া হইত। কিন্তু এ সকলের কিছুই তাঁহার সাধনায় বাধা দিতে পারে নাই। ঈশ্বরচন্দ্র পাঠে কখনও শিথিল-প্রযত্ন হয়েন নাই।

ইংরাজীতে বলে "TIME IS MONEY" অর্থাৎ সময়ই অর্থ। বাস্তবিক দরিদ্র বিদ্যার্থী অর্থাভাবে যেমন কষ্ট পায়, সময়াভাবে সে ততোধিক কষ্ট পায়। অর্জ্জন ও অধ্যয়ন, উভয়ই সময়-সাপেক্ষ। অর্থাভাব হেতু তাহার যে ক্ষতি হয়, সময়ের অল্পতা হেতু তাহার আরও অধিক ক্ষতি হয়। পাঠের পক্ষে ইহা একটি প্রধান অন্তরায়। শরীর ও মনের বিশেষ বল না থাকিলে এই প্রকার বাধাকে অতিক্রম করা দুরূহ। ঈশ্বরচন্দ্র অর্থাভাব হেতু সময়াভাব বোধ করিতেন। পাচক ও দাসীর বেতন দিবার সামর্থ্য থাকিলে,তিনি প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে পাঠের জন্য যথেষ্ট সময় পাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের তখন সে ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং স্বহস্তে দুবেলা পাক, পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পরিচর্য্যা প্রভৃতি কর্ম্ম সমাপন করিয়া, অধ্যয়নের যে প্রকৃষ্ট সময়, প্রাতঃকাল ও প্রথম রাত্রি, তাহা তিনি পাইতেন না; অথচ তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল। দৈহিক ক্ষুৎপিপাসার অপেক্ষা তাঁহার মানসিক ক্ষুৎপিপাসা প্রবলতর ছিল। অদম্য জ্ঞান-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি সাধনার্থ তাঁহাকে বিশ্রাম ও নিদ্রার সময় অল্প করিতে হইত। যে সময় অন্য বালক পরিশ্রমান্তে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিত—সে সময় ঈশ্বরচন্দ্র পাঠে তন্ময়চিত্ত। যে সময়ে প্রকৃতি সুষুপ্তির ক্রোড়ে অচেতন, দরিদ্র ব্রাহ্মণবালক তখন ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণালোকে অধ্যয়ন-তৎপর। সমস্ত দিবসের উৎকট পরিশ্রমের পর দেহ অবসন্ন

হইয়াছে—শ্রান্তদেহ বিশ্রাম চাহিতেছে, নিদ্রা আসিয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত মস্তকটি নিজ ক্রোড়ে লইতে চাহিতেছেন; কিন্তু ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র দেহের সে অবসন্নতা উপেক্ষা করিয়া জননী নিদ্রাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। যখন ছাত্ররূপী ঈশ্বর-চন্দ্রের এইরূপ অধ্যয়ন-তপঃ সাধনা দেখি, তখন হৃদয়-মন বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব প্রশংসার ভাবে পূর্ণ হয়। "ছাত্রদিগের অধ্যয়নই যে তপ" এ কথা তিনি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি এক জন উৎকৃষ্ট ছাত্রের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের বহুবিধ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়েন এবং তাহার জন্য অনেক বৃত্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। পরিশেষে উনবিংশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্ররূপে বিদ্যামন্দিরে সাধনা শেষ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র এখন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও সাক্ষাৎভাবে ছাত্ররূপে অধ্যয়ন শেষ করিলেন সত্য, কিন্তু তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে পরবর্ত্তী জীবনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত থাকেন। সংস্কৃত কলেজের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পাঠ্য-পুস্তক পাঠে তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তি হয় নাই। উত্তর-জীবনে তিনি বহুবিধ সংস্কৃত শাস্ত্র ও আর কয়টি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তাঁহার বৃহৎ পুস্তকাগার দেখিলেই বুঝা যায় যে, তিনি কিরূপ অধ্যয়নপর ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনের কিছুদিন পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজে পঞ্চাশ টাকা বেতনে শিক্ষকের পদ পান। তখনকার সিভিলিয়ানদিগের দেশীয় ভাষা ও আইনাদির শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য ঐ কলেজ স্থাপিত হয়। সাহেবদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে হইলে ইংরাজী ও হিন্দি জানা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা করিতেন, তাহা উত্তমরূপেই করিতেন। ইহাই তাঁহার প্রকৃতি

ছিল। সুতরাং সাহেবদিগের সুশিক্ষার জন্য নিজে কলেজ ত্যাগের পর শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ইংরাজী ও হিন্দিভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সাহেবদিগের বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তকের অভাব থাকায়, তাহা দূর করিবার মানসে, বাসুবেদ চরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবনচরিত রচনা করেন। বাসুদেবচরিত মুদ্রিত হয় নাই। অপর দুই খানি মুদ্রিত হয়। বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিকল্পে ঐ দুখানি পুস্তকই তাঁহার প্রথম প্রয়াস। এখানে কিছুদিন কর্ম্ম করার পর, তিনি সংস্কৃত কলেজে-সহকারী সম্পাদকের কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। কিছুকাল এই কর্ম্ম করার পর তদানীন্তন সম্পাদকের সহিত, কোন সংস্কারকার্য্যে, তাঁহার মতান্তর হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় তিনি আত্মসম্মানের অনুরোধে কর্ম্মত্যাগ করেন। ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজে নিযুক্ত হওয়ার পর হইতেই তিনি পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে দাসত্ব বিমুক্ত করিয়া স্বগ্রামে পাঠাইয়া দেন এবং আপনার আয় হইতে যথাসাধ্য মাসিক অর্থসাহায্য করিতেন। বাকী টাকায় কলিকাতার বাসায় অনেক গুলি আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করিতেন। অর্থকষ্ট যে কিরূপ ভীষণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা জানিতেন। কিন্তু দরিদ্র হইলেও তিনি আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ছিলেন না। সেই জন্য পুনরায় অর্থকষ্ট হইবে জানিয়াও তিনি আত্মসম্মানের অনুরোধে সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মত্যাগ করিলেন। যাহা হউক ইহার অল্পদিন পরে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড্ রাইটারের পদ প্রাপ্ত হন এবং তৎপরে পুনরায় সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে তথাকার সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যতৎপরতায় প্রীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে ক্রমে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কয়েকটি জেলায়

অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যও করিতে হইত। এই সময় তাঁহার মাসিক আয় ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা। এই সময় তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার সাহেবের সহিত মতভেদ হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অম্লানবদনে ত্যাগ করেন। ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজের শিক্ষকতা হইতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কার্য্য পর্য্যন্ত গর্ভমেণ্টের অধীনতায় তাঁহার চাকরীর কাল বলিয়া পরিগণিত। অধ্যক্ষতা ত্যাগের সময় তিনি ডিরেক্টর সাহেবকে ইংরাজীতে যে পত্র লেখেন, তাহার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার যে তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান সঙ্কল্প ছিল, তাহা উহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঐ পত্রে তিনি তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান সঙ্কল্পের কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বদেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য তাঁহার চিরকালই গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করাতে, যদিও সাক্ষাৎভাবে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইল, তথাপি বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিবেন, ইহা তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা ছিল। তিনি স্বদেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা-বিস্তার-রূপ যে সুমহান্ ও পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সাধনা জীবনের সহিত শেষ করিবেন, ইহাও ঐ পত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়াছিলেন।

এত দিনে আমরা তাঁহার জীবনের সঙ্কল্পের কথা তাঁহারই মুখে শুনিলাম। এক্ষণে তাঁহার জীবনীবিবৃতকার্য্যকলাপে সেই সঙ্কল্পের সাধনা দেখা যাউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকৃত সাধক ছিলেন। তিনি জীবনে কখন তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ভুলেন নাই। কথিত আছে, একদা তিনি ফোর্টউইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা করিতেছেন এমন সময়ে, এক

দিন লর্ড হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার কথা উঠে। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের প্রতি গবর্ণমেণ্ট তেমন অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না; তাঁহাদের জীবিকার জন্য কাজকর্ম্ম মিলা ভার। ইহার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃ কমিতেছে; গবর্ণমেণ্ট ইহাদের জন্য কিছু করিলে ভাল হয়। ইহার পরই লর্ড হার্ডিঞ্জ একশত একটি বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের জন্য সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত ছাত্রগণকে শিক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য আদেশও দেন। এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের মূলে, সুন্দর সৌধের ভিত্তির ন্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় লুক্কায়িত। এই অনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রত্যক্ষ ও গৌণভাবে সংস্কৃত শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার যে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ইহার পর যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন, তখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার, বহুমূল্য রত্নরাজির ন্যায় হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের মুদ্রণ, সহজবোধ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সহজপাঠ্য সংস্কৃত পুস্তক সঙ্কলন প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য দ্বারা দেশে দেবভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই অতিরিক্ত পরিদর্শকের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, দেশের শিক্ষাবিস্তারের বহুল সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপে বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পূর্ব্বাপর জানিতেন যে, দেশে সুপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকের অত্যন্ত অভাব। ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজে শিক্ষাদান করিবার সময় তাঁহার বিদেশীয় ছাত্রবর্গের জন্য দু একখানি গ্রন্থ রচনার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে

তিনি স্বদেশীয় বালক ও যুবকগণের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনিই লোকের মনে জ্ঞান-তৃষ্ণার সঞ্চার করেন এবং তিনিই উপযুক্ত পুস্তক রচনা করিয়া সে তৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনার্থ সুশীতল পানীয় প্রস্তুত করেন।

বিভীষিকাপূর্ণ সাধনক্ষেত্রে সাহসের আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে সে সাহস যথেষ্ট ছিল। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা করিবার জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিতে কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ইতি পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের সহিত মতভেদ হওয়ায় কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না ব'লয়া, কর্ম্মত্যাগ করেন, এ কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর আবার ডিরেক্টর সাহেবের সহিত যখন মতভেদ হয়, তখনও আত্মসম্মান ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা বেতনের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে তিনি একটি বৃহদ্ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন। ব্যাপারটি সুসম্পন্ন করা অন্যান্য বিষয়সাপেক্ষ হইলেও প্রচুর অর্থসাপেক্ষ ছিল। ব্যাপারটি আর কিছুই নহে - বিধবাবিবাহ-প্রচলন। শাস্ত্রের সাপেক্ষতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজের অনুমোদনসাপেক্ষতা, হিন্দু-সমাজের সাপেক্ষতার উপর উহা নির্ভর করিলেও উহার প্রচলনের জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ সম্পত্তি ছিল না—নিজে ইদানীং মোটা মাহিনা পাইলেও আত্মীয় স্বজন পালনে এবং দীন দুঃখীর সেবায় ও অন্যান্য সদ্ব্যয়ে ইহার সমস্ত খরচ হইয়া যাইত। সুতরাং নিজের উপার্জ্জিত ধনও এত সঞ্চিত ছিল না যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া চাকরী ত্যাগ করিতে সাহসী হয়েন। যখন কর্ম্মত্যাগ করেন, তখন তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। তিনি বহু আশ্রিত জনের প্রতিপালক, অনেক রাজা মহারাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু, অনেক বড় বড় সাহেব সুবার শ্রদ্ধার পাত্র ও

পরামর্শদাতা। দেশের গণ্য মান্য লোক তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন—তাঁহার মিত্রতায় আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। কলিকাতা-সমাজে যাহার এরূপ প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, তিনি কোন ভরসায় এমন একটা বড় চাকরী ত্যাগ করিতে সাহসী হইলেন এ প্রশ্ন স্বতঃই লোকের মনে হয়। বাস্তবিক প্রকারান্তরে একজন বড়লোক তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্নও করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর-সুহৃদ্ বাঙ্গালার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবই তাঁহাকে প্রকারান্তরে পরামর্শচ্ছলে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন বুঝিয়াছি এক পোয়া চাউল হইলে, দরিদ্র ব্রাহ্মণের দিনপাত হইবে, তখন আর অর্থের অনুরোধে আত্মসম্মান নষ্ট করিব কেন?" এরূপ মনের বল না থাকিলে কি কখন কেহ তাঁহার মত অবস্থায় এমন কথা বলিতে পারে? তিনি নির্লোভ, অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি বিষয় বিভবের মধ্যে বাস করিয়া তাহার মোহে আচ্ছন্ন হয়েন নাই। তিনি নিজের সুখবিধানের জন্য অভাব বৃদ্ধি করেন নাই। সামান্য অশন বসনে তিনি চিরদিন পরিতুষ্ট থাকিতেন। বাস্তবিকই এক পোয়া চাউলেই তাঁহার ব্যক্তিগত অভাবের মোচন হইত আর সেই জন্যই অর্থের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইয়া তিনি ঐরূপ কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহার ন্যায় পদ প্রাপ্ত হইলে, মান সম্ভ্রমের অধিকারী হইলে, গণ্যমান্য বন্ধুবর্গ পাইলে, শত অপমান ও নিগ্রহ সহ্য করিয়া চাকরী বাঁচাইয়া চলিতেন। তাঁহারা অবস্থার দাস। তাঁহাদের বিশ্বাস লোকে অবস্থার পূজা করে, অর্থের খাতির করে। তাঁহাদের মতে মানুষে মনুষ্যত্বের আদর বড় কম করে। সুতরাং সুখসম্পদ, মানসম্ভ্রম, লোকজন, বন্ধু-বান্ধবের মূলীভূত কারণ যে অর্থ তাহার জন্য বিবেক-

বুদ্ধি, কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং আত্মসম্মান সকলই বিসর্জ্জন দিতে পারা যায়। এইখানে সাধারণে অসাধারণে পার্থক্য। এইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয় অসাধারণ লোক ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহসী পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন বীরপুরুষকে বরণ করিয়া থাকেন। এই বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মত্যাগ করাতে তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের অধিক চিন্তা হইয়াছিল। যাহা হউক সুখের বিষয় যে, এজন্য তাঁহাদিগকে বেশী দিন চিন্তা করিতে হয় নাই। তাঁহার রচিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পুস্তক সকল হইতে তাঁহার যথেষ্ট আয় হইয়াছিল। শুনা যায়, এক সময় তাঁহার পাঁচ শত টাকার স্থলে পাঁচ হাজার টাকা মাসিক আয় হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সমধিক সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রভূত অর্থের অধিকাংশ দীনহীনজনের দুঃখকষ্টলাঘবের জন্য ব্যয়িত হইত, এবং এইজনা দীনহীনজন তাঁহাকে দয়ার সাগর নাম দিয়াছিল।

বিবিধ পুস্তকাদির প্রচলন দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের পথ তিনিই সুগম করিয়া গিয়াছেন সত্য; সরকারী কর্ম্মচারিরূপে বহুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ সকল ব্যতীত নিজের অর্থ দ্বারা দেশে উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার আর তুলনা নাই। তুলনা নাই এইজন্য বলিতেছি যে, মিশনরী কলেজ ছাড়া বেসরকারী কলেজের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে কলেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, দেশে উচ্চশিক্ষার স্রোত মন্দভাবে চলিতেছিল। সরকারী কলেজে ১২৲ টাকা বেতন দিয়া পড়ার ক্ষমতা সকলের ছিল না। মিশনরী কলেজগুলিতে বেতনের হারও নিতান্ত কম ছিল না। তাহা ছাড়া মিশনরী কলেজে শিক্ষার্থে

যুবকগণকে পাঠান অনেক অভিভাবকের অনুমোদিত ছিল না। ভয়, পাছে তাহারা খৃষ্টান হইয়া যায়। সাধারণে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সুবিধার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহই ঐরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হয়েন নাই। অধুনা দেশীয় শিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত যে সকল কলেজ দেখা যায়, মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসন তাহাদের মধ্যে প্রথম। প্রথম পথপ্রদর্শককে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সমস্তই অকাতরে বীরের ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিতে সহজে সম্মত হয়েন নাই। উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে সবিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। প্রথমে কর্ত্তৃপক্ষগণ মেট্রোপলিটনে এফ, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত খুলিতে অনুমতি দেন। পরে পরীক্ষার ফল ভাল হওয়াতে উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। এই কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। অথচ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ও প্রশংসার বিষয় এই যে, কলেজের এক কপর্দ্দক তিনি নিজের জন্য ব্যয় করেন নাই। এইরূপ নিঃস্বার্থভাব সচরাচর দেখা যায় না।

বঙ্গদেশের সাহিত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চ। লোকশিক্ষার জন্য তিনি জীবনব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিরূপ উপায়ে, কত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি সে পবিত্র ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুণ্যশ্লোক। তাঁহার পুণ্যকাহিনী তাঁহার নামের গুণেই সুশ্রাব্য। সেই ভরসায় ইহা এরূপভাবে এখানে কথিত হইল। আর আশা করা যায় যে, কর্ম্মক্ষেত্রে বঙ্গীয় যুবক

তাঁহার সাধনপ্রসঙ্গ শুনিয়া কর্ত্তব্যব্রতসাধনক্লেশ ভুলিয়া যাইবেন এবং নবীন উদ্যমে সে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চেষ্টা করিবেন।

অনেকের ধারণা, এমন কি বিশ্বাস, যে যাঁহারা চাকরী করেন, তাঁহাদের অবসর অত্যন্ত অল্প, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কোন সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। চাকরীর অনেক অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া মানুষ চাকরী গ্রহণ করিলে জীবিকার্জ্জন ব্যতীত জ্ঞানধর্ম্ম ও জনহিতের জন্য কোন কার্য্য করিতে পারে না, এমন কথা বলা কতদূর সত্যসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত তাহা বলিতে পারি না। যাহার সঙ্কল্প দৃঢ় নহে, আরব্ধকর্ম্মে যাহার আস্থা ও অনুরাগ নাই, তাহার মুখেই এরূপ কথা শোভা পায়। সে ঐরূপ কথা বলিয়া, ওজর করিয়া অন্যকে বুঝাইতে চাহে ও মনকে প্রবোধ দেয়। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই জীবিকার জন্য গভর্ণমেণ্টের অধীনতায় বা অন্যত্র চাকরী করেন। গভর্ণমেণ্ট প্রজারদুঃখ মোচন বা উন্নতিসাধনের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বের অপেক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অধিক। ইঁহারা যদি চাকরীর অজুহাতে সকল হিতকর কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিতে চাহেন, তবে দেশের গতি কি হইবে? তাঁহারা জীবিকা অর্জনের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করুন, কিন্তু অবসর-সময়ে দেশের জন্য ও দশের জন্য ভাবুন, তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন। ইচ্ছা থাকিলে আর প্রাণের সহিত চেষ্টা করিলে, তাঁহারাও যে সকল দিক্ রক্ষা করিয়া যথেষ্ট হিতকরকার্য্য করিতে পারেন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা স্বনাম ধন্য স্যর সৈয়দ আহম্মদের জীবনে দেখিতে পাই। স্যর সৈয়দ আহম্মদ ৩৭ বৎসর গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। সাধারণ সেরেস্তাদারের পদ হইতে নিজের কর্ম্মনৈপুণ্যের গুণে শেষে সদর আলার পদ প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং দেখা যাই-

তেছে যে, তিনি শুধু চাকরী বাঁচাইয়া চলিয়াছিলেন এমন নহে,অধিকন্তু তাহাতে যথেষ্ট উন্নতি ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য যে তাঁহাকে অনেক সময়-ব্যয় করিতে হইত ও বিশিষ্টরূপ পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তিনি কিরূপে স্বজাতির উন্নতিসাধন ও ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা জানা আবশ্যক।

১৮৩৮ খৃঃ অঃ আত্মীয়স্বজনের অমতে তিনি ইংরাজের অধীন দিল্লীর ফৌজদারী আদালতে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার ৪ বৎসর পরে, তিনি মুন্‌সেফের পদপ্রাপ্ত হয়েন। এই সময় হইতে তিনি সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ তিনি দিল্লির প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। দিল্লির প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রথমে ইহার তেমন আদর হয় নাই। পরে যখন ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তখন ইহার উপর সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয়। এই গ্রন্থ রচনার পুরস্কারস্বরূপ তিনি ইংলণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর একজন মাননীয় সভ্যের পদ প্রাপ্ত হয়েন। সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে তিনি নানা স্থানে বদলি হয়েন। ক্রমে ১৮৫৫ খৃঃ অঃ তিনি বিজনৌরের সদর আমিনের কার্য্যে বদলি হইয়া আসেন। ইহার কিছু দিন পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃঃ অঃ মে মাসে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। সেই অগ্নি-পরীক্ষার সময় সৈয়দ আহম্মদ বিজনৌরে। তাঁহারই রাজভক্তি ও বুদ্ধিমত্তার গুণে সেখানকার ইংরাজ পুরুষ, মহিলা ও বালকবালিকাদিগের জীবন রক্ষা হয়। তিনি না থাকিলে, বিদ্রোহী-দিগের হস্তে ইংরাজদিগের যে কি দুর্গতি হইত তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সৈয়দ আহম্মদ এই সময়ে যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা

সাহসিকতা এবং রাজভক্তির পরিচয় দেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মে মাসের মাঝামাঝি বিজনৌরে বিদ্রোহের সংবাদ প্রচারিত হয়। এই দুঃসংবাদ পাইয়া তত্রস্থ ইংরাজগণ আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজনৌরে ইংরাজের সাধারণ জেলার পুলিশ ভিন্ন অন্য সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না। কলেক্টর সাহেব সৈয়দের সাহায্যের জন্য একশত পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, মনে করিলেন দুর্দ্দিনে ইহারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। বিদ্রোহ-সংবাদ বিজনৌরে পহুঁছিবার অল্পদিন পরেই বিজনৌর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের দুর্ব্বৃত্তগণ জেল আক্রমণ করে। সরকারী খাজনাখানা আক্রমণের সম্ভবনা দেখিয়া সৈয়দ আহম্মদ কালেক্টারের অনুমতিক্রমে সমস্ত টাকা কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদল বিদ্রোহী সেনা সেখানে উপস্থিত হইল। সকলেই কি হয় কি হয় ভাবিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই দলের দুইজন অধিনায়ককে কলেক্টর সাহেব ও সৈয়দ আহম্মদ উত্তমরূপে বুঝাইয়া বলায় তাহারা বিজনৌরে কোনও উপদ্রব না করিয়া দিল্লীর পথে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে বিজনৌরের অধিবাসিগণের ভয় দূরীভূত হইল না। আবার কয়েক দিনের মধ্যে শুনা গেল যে, নবাব মহম্মদ খাঁ বহুসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য লইয়া বিজনৌর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই সময় কলেক্টর সাহেবের সংগৃহীত পাঠান সেনাগণের বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ পায়।

ইংরাজদের যাহা কিছু সামান্য আশা ভরসা ছিল, তাহাও গেল। ক্রমে ভীষণ ভবিষ্যৎ ভীষণতর বর্ত্তমানে পরিণত হইল। নবাব মহম্মদ খাঁ সসৈন্যে বিজনৌরে উপস্থিত। যে বাটীতে নগরের সমস্ত ইংরাজ পুরুষ মহিলা ও বালক বালিকা একত্র বাস করিতেছিলেন, তাহা

নবাবের সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইল। বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কখন কি হয়, এই চিন্তায় সকলে আকুল। এমন সময় একটি গুপ্ত পথ দিয়া সৈয়দ আহম্মদ ইংরাজগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পলায়নই তখন একমাত্র উপায় ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু কি উপায়ে উহা সম্ভব—তাহাই সকলে ভাবিতে লাগিলেন। যখন অন্য সকলে ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, তখন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সৈয়দ আহম্মদ বলিলেন, আমি দূতবেশে নিরস্ত্র হইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিব। সৈয়দ সাহেব নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করুন এ কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। কিন্তু নিরস্ত্র হইয়া শত্রুশিবিরে যাইতে তাঁহাকে কেহই পরামর্শ দিলেন না; বরং নিষেধ করিলেন। কিন্তু সৈয়দ তাঁহাদের কথা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। নিরস্ত্র হইয়াই তিনি নবাবের শিবিরে যাত্রা করিলেন। পথে প্রতিপদে প্রহরিগণ তাঁহার গতি রোধ করিতে চাহে। দুই জনের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়াও আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—তখন তিনি সেখান হইতে নবাব শুনিতে পান এরূপ ভাবে, চীৎকার করিয়া বলিলেন, -"আমি মসীজীবী, নিরস্ত্র হইয়া নবাবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছি"।

নবাবের অনুমতিক্রমে প্রহরিগণ পথ ছাড়িয়া দিলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৈয়দ মহোদয় নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া, নিজের আগমনোদ্দেশ্য একান্তে নিবেদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবাব সহচরগণের মনস্তুষ্টি ও মানবৃদ্ধির জন্য বলিলেন যে, তাঁহারা সকলে ত ভাই ভাই—তাঁহাদের মধ্যে গোপনীয় কিছু নাই—তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য, তিনি সর্ব্ব সমক্ষে বলিতে পারেন। অতঃপর সৈয়দ মহোদয় বুঝাইয়া বলাতে নবাব উঠিয়া আসিয়া নির্জ্জনে সকল কথা শুনিলেন। সৈয়দ আহম্মদ নানারূপে নবাবকে বুঝাইয়া শেষে

দুটি প্রস্তাব করিলেন। একটি—নবাব, তিনি ও অন্যান্য কয়েকজনে মিলিয়া ইংরাজগণকে হত্যা করা, অপরটি, ইংরাজদিগকে স্থানত্যাগে সাহায্য করা। দ্বিতীয়টিতে সম্মতি দিলে, তাঁহারা নবাবকে লিখিয়া পড়িয়া সে বিভাগের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবেন; এবং খাজনা-খানা ও অন্যান্য সমস্ত মালপত্র তাঁহার হস্তে দিবেন। এই সঙ্গে সৈয়দ সাহেব ইঙ্গিতে ইহাও বলেন যে ইংরাজদিগকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। কারণ, দিল্লী শীঘ্রই ইংরাজের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কি জানি, যদি তাঁহারা জয়ী হন, তবে ইংরাজ হত্যার ফল বিষময় হইতে পারে। নবাব বুদ্ধিমানের মত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি স্বীকার করিলেন এবং যান-বাহন ও অর্থাদি দ্বারা ইংরাজ-দিগের পালায়নের সাহায্য করিলেন। কলেক্টর সাহেব সৈয়দ মহোদয়ের সহযোগে পারসীতে একখানি ফারমান লিখাইয়া নবাবকে দিলেন। নবাব মহম্মদ খাঁ তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সৈয়দ সাহেবকেই তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—কিন্তু সৈয়দ সাহেবের সর্ত্তে নবাব সম্মত না হওয়াতে তাহা ঘটে নাই। ইংরাজেরা ত বিজনৌর হইতে স্থানান্তরে গিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। সৈয়দ আহম্মদ ভগবান ও ভাগ্যের উপর ভরসা করিয়া, সেই শত্রুপুরীতে রহিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই সকল কথা বিভাগীয় কমিশনর সাহেবকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বিভাগীয় কমিশনর স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সৈয়দ আহম্মদকেই জেলার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।

এই ঘটনার এক মাস গত হইতে না হইতে পুনরায় বিজনৌরে উপদ্রব আরম্ভ হইল। একদল হিন্দুসেনা একখানি মুসলমানের গ্রাম ধ্বংস করে। তাহাতে মুসলমানেরা বিদ্রোহী হয় এবং সৈয়দ আহম্মদ-কেই উহার মূল কারণ মনে করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টা করে।

তিনি কোনরূপে নগর হইতে নগরান্তর—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে দেড় মাস পরে নিজ জন্মভূমি দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই দিল্লী লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দিল্লী তখন সদ্যঃ বিপন্মুক্ত। বিদ্রোহী দল বিপর্য্যস্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তখনও তাহাদের অত্যাচারের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। সৌধ-সুশোভিত সেই সুন্দর নগর যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সৈয়দ আহম্মদ আসিয়া জন্মভূমির এই দশা দেখিলেন—কিন্তু জননীকে দেখিতে পাইলেন না। ইংরাজের অনুরক্ত ও বিশ্বাসী বন্ধু এবং কর্ম্মচারী জানিয়া বিদ্রোহিগণ তাঁহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী অনেক কষ্টে কোনরূপে অশ্বপালকের গৃহে তৃণস্তূপের মধ্যে লুকাইয়া আছেন, এই কথা তিনি শুনিতে পাইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর পুত্র মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন– মাতা পুত্রের মিলন হইল।

বিদ্রোহের বিপদ এইরূপে কাটিয়া গেল। দেশে ক্রমে শান্তি স্থাপিত হইতে লাগিল। সৈয়দ আহম্মদ ক্রমে বিজনৌর হইতে গাজিপুরে বদলী হইলেন। শুভক্ষণে তিনি গাজিপুরে বদলী হন। ইতিপূর্ব্বে সৈয়দ মহোদয়ের সাহিত্যসেবার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে লাগিল। গাজিপুরে আসিয়া তিনি একটি বিজ্ঞান সভা স্থাপন করেন। এই সময়ে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক কর্ণেল গ্রাহামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কর্ণেল সাহেব, সৈয়দ আহম্মদকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন—তাঁহাকে সোদরপ্রতিম জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম, তিনি শুভক্ষণে গাজিপুরে বদলী হইয়াছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার সুফলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও

গভীর আস্থা ছিল। ইংরাজী ভাষা অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার। ইহাতে লিখিত গ্রন্থ সকল দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইলে, এবং তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে, দেশের যে অশেষ কল্যাণ হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অবশ্য এই অনুবাদ কার্য্য দ্বারা ইংরাজী শিক্ষার গতিরোধ করা যে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। গাজিপুরে অবস্থান কালে তাঁহার পরামর্শ ও নির্দ্দেশে অনেকগুলি ইংরাজী সদ্‌গ্রন্থ উর্দ্দূ ভাষায় অনূদিত হয়। এই সভার কর্ম্মস্থান পরে গাজিপুর হইতে আলিগড়ে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সভা দ্বারা উর্দ্দূ ভাষার অঙ্গ সবিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত, বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্পবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ উর্দ্দূ ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ইহার জন্য উর্দ্দূ ভাষাও সৈয়দ আহম্মদের নিকট বিশেষ ঋণী।

রাজভক্ত সৈয়দ আহম্মদ যে ইংরাজের পরম হিতৈষী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। রাজকর্ম্মচারী হইয়া রাজা ও প্রজার কল্যাণের জন্য রাজনীতির আলোচনা করিতে, তিনি কখনও বিরত হয়েন নাই। তিনি সৎসাহসী ও সত্যবাদী ছিলেন। ইংরাজের চরিত্রের মহত্ত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত ইংরাজ, ন্যায়ের ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত কথা এই যে, সৈয়দ আহম্মদ একজন বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন। তিনি বিশ্বাসের বলে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছেন। তিনি সাধারণ্যে যে সকল ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে এবং তাঁহার অন্যান্য সর্ব্ব কার্য্যে, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রমাণ পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হই। তিনি স্বদেশের উন্নতির জন্য সতত চিন্তা করিতেন। শাস্তা ও শাসিতের মধ্যে যাহাতে সখ্য স্থাপিত হয়, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক কামনা ছিল এবং এজন্য স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়া

গিয়াছেন। প্রজার প্রতিনিধি যাহাতে রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রণাসভায় স্থান পান—বিধি-প্রণয়ন-কালে যাহাতে তাঁহার যুক্তি শুনা হয়—এদেশের সুখ দুঃখের কথা যাহাতে বিলাতে মহাসভায় উত্থাপিত হয়—তাহার জন্য তথায় প্রতিনিধি সভার প্রতিষ্ঠা হয়—এ সকলের জন্য তিনি বহুকাল পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সৈয়দ আহম্মদ যে সকল বক্তৃতা করেন, তদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারি, তিনি কিরূপ আন্তরিকতার সহিত রাজা ও প্রজার রাজনৈতিক কল্যাণ কামনা করিতেন।

যে সকল কর্ম্ম করিলে এবং যেরূপ সুখসম্পদ ও মানসম্ভ্রম লাভ করিলে, লোকে আপনাকে সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত মনে করেন সৈয়দ আহম্মদ সে সকলই করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যে বয়সে আমাদের দেশের লোক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সেই বয়সে সৈয়দ আহম্মদ দ্বিগুণ উৎসাহে সঙ্কল্পিত কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ এপ্রিল মাসে সৈয়দ আহম্মদ দুইটি পুত্ররত্ন লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। কেম্বিজে পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত এবং ঐ ইতিহাস-প্রসিদ্ধকলেজের কার্য্য-প্রণালী দর্শনে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে মুসলমানগণের জন্য তদনুরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠা এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডে তিনি ভারত-প্রত্যাগত অনেক গণ্যমান্য সাহেব বন্ধু পাইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা হইয়াছিল। এখানে তাঁহার লিখিত মহম্মদের জীবনীর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং উহা তিনি তুরস্কের সুলতান ও মিশরের খেদীবকে উপহার পাঠান। এই উপলক্ষে তিনি সুলতানকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি লেখেন যে, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞাপন বিস্তার ও সভ্যতার প্রসারের সহিত মুসলমান-

ধর্ম্মনীতির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে এবং এই সত্যই ঐ গ্রন্থে প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই পত্র ও তাঁহার লিখিত অন্যান্য পত্রাবলীতে দেখা যায় যে, তিনি কিরূপ উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁহাতে ছিল না। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মী ভ্রাতৃগণকে ভ্রান্তসংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকৃত ইস্‌লামের সেবা করিতে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন।

১৮৭০ খৃঃ অঃ শেষে সৈয়দ সাহেব বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া কাশীতে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হয়েন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি "মুসলমান সমাজসংস্কারক" নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। মুসলমান সমাজের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য, মুসলমানগণ স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যাহাতে বর্ত্তমান যুগের শিল্প বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য আলোচনার দ্বারা সম্যকরূপে উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি ক্রমাগত লিখিতে লাগিলেন। এই পত্র দ্বারা মুসলমান-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক নিন্দা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। মুসলমান সমাজ শতমুখে উচ্চকণ্ঠে সৈয়দ সাহেবের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। বিদেশে—মক্কায় মোল্লা ও মৌলবীগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী নাস্তিক প্রভৃতি শব্দাবলীতে অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরসমীপে তাঁহার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। এমন কি অনেকে ঈশ্বরের ক্রোধোদ্রেকের অপেক্ষা না করিয়া, হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, তাঁহাকে বেনামী পত্রও লিখিয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ এ সকল উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, অবিচলিতচিত্তে তাহারই সাধনা অক্লান্তভাবে করিতে লাগিলেন। স্বদেশের কল্যাণ, স্বজাতি স্বধর্ম্মী মুসলমানগণের কল্যাণ কামনা ও সাধনা করিতে তিনি ক্ষণকালের জন্য বিরত হয়েন নাই।

বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া,তিনি অবসর পাইলেই নানা স্থান হইতে তাঁহার প্রস্তাবিত আলিগড় এঙ্গলো ওরিয়েণ্টেল কলেজের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ১৮৭৬ সালে ৩৭ বৎসর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সহিত চাকরী করিয়া পেন্সন লইলেন। এখন হইতে তাঁহার অবসর সময়ের বৃদ্ধি হইল। অতঃপর তিনি কায়-মনে সমগ্র অবসরকাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ অঃ সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার আলিগড়ে অবস্থান কালে এ,ও, কলেজের শিক্ষার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই সময় তিনি কতকগুলি শিক্ষিত মুসলমানকে লইয়া একটী সমিতি গঠন করেন কি উপায়ে উত্তমরূপে মুসলমানদিগের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণার্থ ঐ সমিতির জন্ম। কি কারণে মুসলমানগণ গভর্ণমেণ্টের স্কুল ও কলেজে তাদৃশ আগ্রহের সহিত আপন আপন সন্তানগণকে শিক্ষার জন্য পাঠান না, কি হেতুই বা তাঁহারা আপন আপন সন্তানগণকে পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে দেন না, তাহা স্থির করিবার জন্য সমিতি সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হইলেন। এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য তিনটি পুরস্কার, সমিতি কর্ত্তৃক ঘোষিত হইল। এইসকল রচনা ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া এ, ও, কলেজের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়। প্রথমে অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া প্রস্তাবিত কলেজের স্কুল বিভাগ খোলা হয়। তাহার পর ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন আলিগড়ে আসিয়া সৈয়দ আহম্মদের কীর্ত্তি মন্দির—বর্ত্তমান প্রশস্ত এ, ও, কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মুসলমানগণের ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার থাকাতে তাঁহারা সৈয়দ আহম্মদের কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রথমে সাহায্য করেন নাই; বরং বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষা

সুন্দররূপে চলিতেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবকগণ দলেদলে উপাধি মালায় ভূষিত হইতেছিলেন, তখন ১৮৫৮—১৮৭৫ সালব্যাপী সময়ের মধ্যে পশ্চিমোত্তরপ্রদেশে সৈয়দ আহম্মদ জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। হিংস্রজন্তুপূর্ণ কণ্টকবৃক্ষ বেষ্টিত বনভূমি পরিস্কৃত করিয়া, তথায় সুধাধবলিত সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, স্থপতিকে যেরূপ ক্লেশ ও নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়, সত্যসন্ধ সৈয়দ আহম্মদকে, সম্প্রদায়ের হিংসাদ্বেষপুর্ণ ভ্রান্ত সংস্কারপূর্ণ মনোভূমিতে জ্ঞানের সৌধ নির্ম্মাণ করিতে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যখন পশ্চিমোত্তর প্রদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সৈয়দ আহম্মদ জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের প্রথম চেষ্টার সূত্রপাত করেন তখন সে প্রদেশের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ইংরাজী শিক্ষার উপর ত লোকের ঘোর বিদ্বেষ ছিল। গবর্ণমেণ্টপ্রতিষ্ঠিত স্কুল পাঠশালায় দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেও লোকের আপত্তি ছিল। বিদ্যালয়-পরিদর্শক কোন সরকারী কর্ম্মচারী গ্রামে যাইলে লোকে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক আসিয়াছে বলিয়া দূরে পলায়ন করিত। যে সকল হিন্দু পরিবার হইতে এই সকল স্কুলপাঠশালার ছাত্র আসিত, তাহাদিগকে অনেক সময় প্রতিবেশিগণের নিন্দা, এমন কি অনেক সময় নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হইত। সাধারণ স্কুল পাঠশালায় পাঠাইয়া ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া মুসলমানদের এক প্রকার রীতি বিরুদ্ধ ছিল। ধনী আমীর ওমরাওগণের ছেলেরা বাটীতে মৌলবীর কাছে শিক্ষা করিত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা প্রায়ই সন্তানের শিক্ষার আবশ্যক বোধ করিতেন না। আলস্যে নাচতামাসায় দিন কাটান নিন্দার কথা ছিল না। সাধারণতঃ মুসলমানেরা লেখনীর পরিবর্ত্তে তরবারি পছন্দ করিতেন। তখনও বাদশাহের জাতি বলিয়া বীরত্বের বৃথা অভিমান ছিল। কোন প্রবীণ মৌলবীকে পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা

বলিলে তিনি ঝটিতি ঘৃণার সহিত নাসাকুঞ্চন করিয়া আবক্ষোবিলম্বিত শ্মশ্রুতে হাত দিয়া বলিতেন,—সরকারী স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না, নেমাজ পড়িতে দেওয়া হয়না,মুসলমান ধর্ম্মেরপ্রতি সম্মান করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় না, বালকদিগের খৃষ্টান হইবার সম্ভাবনাই বেশী ইত্যাকার নানা কথা এক নিশ্বাসে বলিতেন। মোল্লা মৌলবীরা স্থিতিশীল। কিন্তু তাঁহাদের মতই সাধারণের মত। তাঁহাদের যুক্তি ও মত যে ভ্রান্ত, পাশ্চাত্যশিক্ষা যে ধর্ম্মানুমোদিত একথা বুঝাইতে সৈয়দ আহম্মদকে যে কত নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই সকল কষ্ট নিগ্রহ ও নিন্দা সহ্য করিয়া স্বজাতির কল্যাণ-কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তিনি তাহার সাধনা এত দিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছিলেন। ভারতে রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক এ, ও, কলেজের ভিত্তি স্থাপন করাইয়া স্বজাতির কল্যাণকামনাটিকে যেন প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃঢ় দুর্গে রাখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে চিন্তা-ভারের লাঘব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজ এতদিনে রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইল। রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি ইহার উপর পতিত হইল।

অতঃপর কলেজ গৃহের জন্য সৈয়দ সাহেব অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইলেন। এজন্য তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন—এক রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে গিয়াছেন। অনেক হিন্দু রাজা ও মুসলমান নবাব এতদর্থে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ভাবুকের ভাষায় অলঙ্কার দিয়া বলিলে, তিনি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া, মুখের অন্ন ত্যাগ করিয়া, কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। সরল ভাষায় তিনি সত্য সত্যই স্বদেশী বিদেশী অনেকের কাছেই অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তিনি হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হইলে সেখানকার লোকে তাঁহার সম্মানার্থে একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন। সৈয়দ আহম্মদ এই কথা অবগত হইয়া বলেন যে, ভোজে তিনি তত তৃপ্ত বা

সম্মানিত হইবেন না। ভোজের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই কলেজের জন্য দিলে, তিনি বেশী সুখী ও সম্মানিত হইবেন। ভাবুকের ভাষায় ইহাই মুখের অন্ন ত্যাগ করা। এইরূপে ও অন্যান্য লোকের প্রদত্ত অর্থে, তিনি সে যাত্রায় এক হায়দ্রাবাদ হইতে ত্রিশ হাজার টাকা আনেন। বৃদ্ধ বয়সে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া তিনি কলেজগৃহ নির্ম্মাণের জন্য হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান পার্সী প্রভৃতি সর্ব্ব ধর্ম্মের লোকের নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই জীবদ্দশায় কলেজের গৃহনির্ম্মাণ হইয়াছিল। মুখ্যতঃ মুসলমানগণের শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও সর্ব্বশ্রেণী ও সর্ব্ব ধর্ম্মের লোকের শিক্ষার জন্য ইহার দ্বার সতত উন্মুক্ত। মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য এ, ও, কলেজ আদর্শস্থানীয়। নূতন ও পুরাতনের এমন অপূর্ব্ব সম্মিলন কদাচিৎ দেখা যায়। এখানে মোল্লা ও মৌলবীগণের বাঞ্ছিত আরবীয় ধর্ম্ম দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষার সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্য, গণিত বিজ্ঞানের সুন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মুসলমান ছাত্রবর্গের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য নেমাজের ব্যবস্থা আছে। যে বোর্ডিংএর প্রথা অধুনা বাঙ্গালায় প্রচলিত হওয়াতে আমরা সৌভাগ্য মনে করিতেছি, স্যর সৈয়দ বহুকাল পূর্ব্বে তাহার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া এ, ও, কলেজের সহিত তাহা স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। স্যর সৈয়দের কার্য্যে তাঁহার দূরদৃষ্টি দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। বহুদিনের পর হিন্দুগণের কল্যাণ কামনায় কাশীতে এই আদর্শের একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহামতি রিপণের শাসনকালে ভারতের শিক্ষানীতির উন্নতিকল্পে একটি শিক্ষাসমিতি (এডুকেশন কমিশন) গঠিত হয়। স্বনাম প্রসিদ্ধ ভারতহিতৈষী ডাক্তার হাণ্টার ইহার সভাপতি ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনেক গণ্যমান্য শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ভদ্রলোক ইহার সভ্যানিযুক্ত

হয়েন। বঙ্গগৌরব মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও স্যর সৈয়দ আহম্মদের কৃতী পুত্র মাননীয় জজ মামুদও ইহার সভ্য ছিলেন। ভারতের প্রজাগণের বিশেষতঃ মুসলমানগণের শিক্ষার বিষয় স্যর সৈয়দ বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফল সমিতির সমক্ষে বলিবার জন্য তিনি কমিশন কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েন। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শিক্ষা সম্পর্কীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হয়েন। বৃদ্ধ সৈয়দ সাহেব রজতশুভ্র-শ্মশ্রুশোভিত গম্ভীরমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় জীবনব্যাপী শিক্ষাসংস্কারবিষয়ক সাধনার কথা সমিতির সমক্ষে বলিতেছেন। সেই শিক্ষাসমিতির মধ্যে তাঁহার পুত্ররত্ন মাননীয় জজ মামুদ সদস্যরূপে সমিতির শোভা, এবং সৈয়দ সাহেবের আনন্দ ও গৌরবের বৃদ্ধি করিতেছেন। পিতাপুত্রের এমন অপূর্ব্বসম্মিলন বাস্তবিক বড়ই মনোহর। এখনও কল্পনার সাহায্যে সেই দৃশ্য মনে করিলে আনন্দ হয়। আর প্রাচীন কবির সহিত বলিতে ইচ্ছা করে, "সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।" এই পবিত্র সঙ্গমে আমরা স্যর সৈয়দ আহম্মদের সাধনপ্রসঙ্গ শেষ করিলাম। আশা করি, কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় যুবক স্যর সৈয়দ আহম্মদের গৌরব ও ভাগ্যের অভিলাষী হইয়া, সাধনক্ষেত্রে তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন।

সমাজবিপ্লবের সময় স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, আস্থা ও নিষ্ঠার সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান করিয়া, প্রাচীনকালের ঋষির ন্যায় সরল নিরহঙ্কার এবং নিরলস হইয়া, কেবল মাত্র দেবভাষা সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াও যে বর্ত্তমান যুগে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা সম্যকরূপে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য আমরা পণ্ডিতকুলতিলক তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনের সাধনার কথা আলোচনা করিতেছি।

তারানাথ আশৈশব অধ্যয়নপর ছিলেন। বালক তারানাথ অষ্টম বর্ষ বয়সে পাঠশালায় যাহা কিছু শিখিবার তাহা শিখিয়া লইলেন। গ্রাম্যগুরু তারানাথকে যখন আর নূতন কিছু শিখাইতে পারিলেন না তখন তারানাথ পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং ৯।১০ বৎসর পিতা ও জ্ঞাতিভ্রাতার নিকট মনোযোগ পূর্ব্বক ব্যাকরণ, কোষ ও কাব্য অধ্যয়ন করিয়া সেই সকল শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উত্তরকালে তারানাথ একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই ব্যাকরণের পাঠ তিনি স্বগৃহেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামে যে পরিমাণে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে, উপাধি লইয়া সময়ে একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়া নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু সেরূপ জীবন তারানাথ বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু নিজ গ্রামে বা তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোন গ্রামে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা মিটায় এমন কোন গুরু ছিলেন না। সুতরাং সম্যক্‌রূপে বিদ্যাশিক্ষার জন্য সোৎসুকচিত্তে তিনি স্থানান্তরের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শেষে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বিদ্যামন্দির বাগ্দেবীর আরাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কলিকাতার তাৎকালিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। একেত কলিকাতায় থাকিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা ছিল, তাহা ছাড়া লোকের ধারণা ছিল যে, যুবকেরা ঐ স্থানে থাকিলে উচ্ছৃঙ্খল ও বিধর্ম্মী হইয়া যায়। তারানাথের পিতারও এই ধারণা ছিল। সেই জন্যই তারানাথকে কলিকাতায় পাঠাইতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এই সময়ে স্বনাম প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় কালনায় তারানাথদের বাটীতে উপস্থিত হয়েন। রামকমল সেন তখন সংস্কৃত কলেজের

সম্পাদক ছিলেন। তিনি তারানাথের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিদ্যা শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া, তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতাকে পরামর্শ দেন; এবং বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহার অভিভাবকতায় থাকিলে, তারানাথের উচ্ছৃঙ্খল বা বিধর্ম্মী হইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু এইরূপ বুদ্ধিমান যুবক সংস্কৃত পড়িলে উত্তর-কালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইবেন। এই প্রস্তাবে তারানাথের পিতা সম্মত হইলেন।

তারানাথ অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তারানাথ ১৮৩০ খৃঃ অঃ মে মাসে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয়েন। ক্রমে ক্রমে তারানাথ অলঙ্কার, সাহিত্য, বেদান্ত, জ্যোতিষ, ও ন্যায় শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। একেত তারানাথ প্রতিভাসম্পন্ন ও শ্রমশীল ছিলেন, তাহার পর তিনি যে সকল অধ্যাপকগণের নিকট ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারাও তৎকালে তত্তৎ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তারানাথের পক্ষে সকল দিকে সুবিধা হইল। তারানাথ, জয়গোপাল তর্কলঙ্কারের নিকট কাব্য, যোগধ্যান মিশ্রের নিকট জ্যোতিষ, নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত এবং নিমচাঁদ শিরোমণির নিকট ন্যায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষা ও সদ্‌গুরু পাওয়া নিরতিশয় সৌভাগ্যের কথা। এ বিষয়ে তারানাথ যথেষ্ট সৌভাগ্যবান ছিলেন। কি ধর্ম্ম, কি জ্ঞান, সর্ব্ব বিষয়েই সদ্‌গুরুর প্রভাব অতিশয় প্রবল। গুণগ্রাহী সদ্ব্যক্তি মাত্রেই গুরুর গুণে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। পুত্র সুশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতে পারিলে, পিতাও গৌরবান্বিত আপনাকে বিবেচনা করেন। মেসিদনের অধিপতি, মহাবীর সেকন্দরের পিতা ফিলিপ তদীয় পুত্রের শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আরিষ্টটলকে পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

সেকন্দরের জন্ম সংবাদ পাইয়া আরিষ্টটল মহারাজ ফিলিপের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ইহাতে, মহারাজ ফিলিপ বলেন যে, হে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ পুত্র হওয়াতে আমি আনন্দিত হইয়াছি সত্য, কিন্তু এইপুত্র যে আপনার জীবদ্দশায় জন্মিয়াছে ও কালে আপনার নিকট শিক্ষা পাইবে, এই বিষয় চিন্তা করিয়াই আমি সমধিক আনন্দিত। জয়গোপাল, নাথুরাম ও নিমচাঁদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের জীবদ্দশায় তারানাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের অন্তিকে নানাশাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারিয়া ছিলেন। সুতরাং তারানাথের পিতার আনন্দ ও গৌরবের কথা মহারাজ ফিলিপের আনন্দের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

তারানাথ অধ্যাপকগণের প্রতি একান্ত ভক্তিমান ছিলেন। অধ্যাপকগণও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তারানাথের পঠদ্দশায় প্রায় সকল পুস্তকই হস্তলিখিত ছিল। তিনি দিবাভাগে অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রিতে অনেক সময় অন্যের পুঁথি দেখিয়া স্বহস্তে পুস্তক লিখিয়া লইতেন। বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রগণের ইহাতে অনেক উপদেশ লইবার বিষয় আছে। এক্ষণে দেখা যায়, অভিধান-সহায়ে পাঠ্যপুস্তকের শব্দার্থ লিখন, ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে শ্রমসাধ্য এবং অনেকে উহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কিছুকাল পূর্ব্বে বিদ্যার্থিগণকে পাঠ্য-পুস্তক পর্য্যন্ত অন্যের পুঁথি দেখিয়া নকল করিয়া লইতে হইত। টীকা ইত্যাদির কথা ত স্বতন্ত্র। একে ত তারানাথের স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তজ্জন্য তিনি সতত অধ্যয়নপর থাকিতেন। তাহার উপর মুদ্রিত পুস্তকাদির অভাব হেতু পুঁথি নকল করার জন্য তাঁহার লিখনের বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়াছিল। তিনি যেমন দ্রুত লিখিতে পারিতেন, তেমনই সুন্দরও লিখিতে পারিতেন। হস্তাক্ষর মুক্তামালার

ন্যায় শোভা পাইত। সর্ব্বদা লিখন পঠনে ব্যস্ত থাকায়, তিনি ছাত্রজীবন হইতে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে পটু ছিলেন। উত্তর-জীবনে বিবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রচারের ও তৎপ্রণীত বাচস্পত্যাভিধান নামক মহাকোষ সঙ্কলনের সামর্থ্যের সূত্রপাত তাঁহার পঠদ্দশাতেই দেখা যায়। তারানাথের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। অধীত শাস্ত্র তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই মহাভারত কণ্ঠস্থ করা সম্বন্ধে কথিত আছ যে, উহা তিনি চেষ্টা করিয়া পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় অভ্যাস করেন নাই। কেবল প্রুফ সংশোধন কালে পাঠ করিয়াছিলেন মাত্র। ছাত্রাবস্থায় যে সূত্রে উহার প্রুফ সংশোধনের সুযোগ হয় তাহা এই ঃ—তারানাথ যখন নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায় পড়েন, তখন এসিয়াটীক সোসাইটীর উদ্যোগে সমগ্র মহাভারত মুদ্রিত হয়। নানা দেশীয় হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া বিভিন্ন পাঠের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মহাভারতের প্রুফ সংশোধনের ভার শিরোমণি মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। যখন এই গুরুভার শিরোমণি মহাশয় নিজশিরে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা। সে অবস্থায় ঐরূপ শ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করা, তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। তারানাথ গুরুভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গুরুদেবের শ্রমলাঘব মানসে স্বয়ং ঐ কার্য্য নিজহস্তে গ্রহণ করেন; এবং অতি দক্ষতার সহিত উহা সম্পন্ন করেন। শেষে যখন ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের নামে প্রচারিত হয়, তখন তাহাতে গুরুর যশ মলিন হয় নাই, অধিকন্তু উহা সমধিক উজ্জ্বলই হইয়াছিল।

ক্রমে তারানাথ সংস্কৃত কলেজে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৫ খৃঃ অঃ তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশার শেষ হইল সত্য। কিন্তু তাঁহার ছাত্রজীবন ঐখানে শেষ

হইল না। তিনি কাশীযাত্রা করিলেন। বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত-বরণা অসি ও জাহ্নবী-পরিবেষ্টিত সেই পুণ্যভূমি বারাণসী জগতে চিরকালই সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। সেই পুণ্যভূমিতে অনেক তত্ত্বদর্শী সংসারবিরাগী সিদ্ধপুরুষ বাস করেন। ইঁহারা শাস্ত্রের অনেক গূঢ় তত্ত্ব অবগত থাকেন। ইঁহাদের নিকট হইতে সত্য জ্ঞানলাভ করিবেন এই ইচ্ছায় তারানাথ কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি একজন পরমহংসের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েন। পরমহংস দেবের নিকট ন্যায়ের প্রসিদ্ধ পুস্তক খণ্ডনখণ্ডখাদ্য অধ্যয়ন করেন। ইহার পর অন্যান্য গুরুর নিকট মহাভাষ্য সহিত পাণিনির ব্যাকরণ, সভাষ্য বেদ ও বেদান্ত, জৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শন, কপিলপ্রণীত সাঙ্খ্য এবং পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া তারানাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাশীতে তারানাথের ছাত্রজীবনের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল। অতঃপর চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যাপনার সময় উপস্থিত হইল। বাচস্পতি মহাশয় অধ্যাপকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই বংশের বোধ হয় তিনিই উজ্জ্বলতম রত্ন। অধ্যাপক হইয়া বিদ্যাদান করা তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। অন্যথা ইতি পূর্ব্বে তিনি আইন পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও সদর আমিনের কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই কেন? সংস্কৃত শিক্ষা ও শাস্ত্র প্রচারের জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি জন্ম সার্থক করিয়া গিয়াছেন এবং প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কালনায় আসিয়া বাচস্পতি মহাশয় চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপকতা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা দেশের পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার যশঃসৌরভে মুগ্ধ হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইতে

লাগিল। চিরন্তন প্রথানুসারে তিনি ছাত্রগণকে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকেই কৃতী ছিলেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা এক প্রকার স্বচ্ছল ছিল। দেবত্তরের আয় ব্যতীত অধ্যাপক-পরিবার বলিয়া সামাজিক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কাণ্ডে বিদায় আদায়েও তাঁহাদের আয় ছিল। এই সকলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকগণ এই সকল উপায় দ্বারাই চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এখন অনেক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক-গণকে সাহায্য করিতেছেন, বৃত্তি এবং পুরস্কার দ্বারা অধ্যাপক ও ছাত্র-গণকে উৎসাহ দিতেছেন। এজন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ গভর্ণমেণ্টর নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে সময় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ না ছাত্রের নিকট বেতন গ্রহণ করিতেন, না রাজার নিকট মাহিনা পাইতেন। অধিকন্তু ছাত্র-গণের অধিকাংশের আহারাদির ব্যয়ভার তাঁহাদিগকেই বহন করিতে হইত। হিন্দুসমাজ যত দিন ক্রিয়াশীল ছিলেন, ততদিন এই ব্রাহ্মণ্য-সমাজ উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন। হিন্দুরাজগণ ও বহুবিত্তশালী ব্যক্তিগণ দেবত্তর ব্রহ্মোত্তর দিয়া মন্দির, মঠ, চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিতেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণও নিত্যনৈমিত্তিক দেবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্যে দান করিতেন। এই সকল কারণে সংযমী সন্তোষণীল অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ প্রতিপালিত হইতেন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলকামনা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারাই উহার ব্যবস্থাপক ছিলেন। মনু যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতির মতে সংস্কার ও প্রায়শ্চিত্তাদির বিধি, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ অনুসারে দায়াদগণের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টনের ব্যবস্থা তাঁহারাই দিতেন। কিন্তু এ সকলের জন্য কখন বিত্ত গ্রহণ

করিতেন না এখন কালবশে সকলেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। নানা কারণে সমাজে বিপ্লব ঘটিয়াছে। অধ্যাপকসমাজ হিন্দুসমাজের নিকট আর সে সাহায্য পান না। যাহাও পান, তাহা অতি সামান্য। তীক্ষ্ণধী বাচস্পতি মহাশয় সমাজের এই ক্রমিক পরিবর্ত্তন পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। চতুষ্পাঠী স্থাপনার পর, স্বয়ং কার্য্যে ব্রতী হইয়া, হিন্দুসমাজের উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য নিরুদ্বেগে করা যে সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিলেন। তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিত। ভগবান তাঁহাকে অনবদ্য স্বাস্থ্য দিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই শ্রমশীল ছিলেন। সুতরাং তিনি যে স্বাবলম্বনের মূল্য ও মর্য্যাদা ভালরূপে বুঝিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য তিনি স্বোপার্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় অতঃপর স্বোপার্জ্জিত ধনে ছাত্রগণকে পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই প্রবর্ত্তনা, তাঁহার অধ্যাপক হইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, দশজন লোক প্রতিপালনের ইচ্ছাও উহার গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ হইয়াও তিনি বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা সকল সময় উদ্দেশ্য ও উপায়ের পার্থক্য বুঝিতে পারি না। আপনাদের আরব্ধ কার্য্যে একের পরিবর্ত্তে অপরটিকে লই এবং অপরের কার্য্যের বিচারকালেও ঐরূপ ভ্রম প্রায়ই করিয়া থাকি। বাচস্পতি মহাশয়ের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক অনেকে ভ্রান্তবিচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যের পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিয়াছেন বা যথার্থ ইতিহাস শুনিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বনের উদ্দেশ্য বিচার করিতে ভুল করিবেন না ইহা বলা যাইতে পারে। বিদ্যাদান যে তাঁহার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প তাহা তিনি কোন দিনও ভুলেন নাই। বাচস্পতি

মহাশয়ের দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য আরও উত্তমরূপে বুঝা যায়। সাধারণতঃ লোকে ভোগবিলাসের জন্য ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বন্ধে একথা ক্ষণকালের জন্য কেহ বলিতে পারেন না। তিনি সংযমী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার অশন বসনে বিলাসের লেশ মাত্র ছিল না। তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন। তাহাও নিরামিষ। পোলাও কালিয়া, কারি কোপ্তার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইত না। পুণ্য-তোয়া জাহ্নবীর জলই তাঁহার স্পৃহণীয় পানীয় ছিল। সে বিশাল দেহ, বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরীয় ও অমল ধবল যজ্ঞোপবীত গুচ্ছে শোভিত থাকিত। বিবিধ বিদ্যার আবাসভূমি সেই মুণ্ডিত মস্তকের শিখাগুচ্ছ ভিন্ন অন্য কোন মণ্ডন ছিল না। স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, উপাস্যদেবতায় অচলা ভক্তি, ক্রিয়াকাণ্ডে বিমল শুচি ও পরম নিষ্ঠার চিহ্ন তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাই। মহদুদ্দেশ্যে বৈশ্যবৃত্তি কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে আদর্শ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কি বলিব? পূর্ব্বতন ঋষি ও ঋষিকল্প ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান সংযম ও নিষ্ঠার জন্য তাঁহারা ভারতের হিন্দু মনোরাজ্যে চিরকাল সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাঁহাদেরই অর্জ্জিত পুণ্য-ফলের প্রভাবে তাঁহদেরই দূরতম বংশধরগণের সমীপে ব্রাহ্মণেতর বহু-বিদ্যা ও বিত্তশালী ব্যক্তি এখনও সংস্কার বশতঃ অবনত মস্তকে শুভাশীষ ভিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণের অবলম্বন সেই জ্ঞান সংযম শুচি ও নিষ্ঠার প্রভাব তারানাথের চরিত্রেও যথেষ্ট ছিল। এখন দেশের বড় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

কালনায় অবস্থিতির কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাচস্পতি মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। প্রথমে বাচস্পতি মহাশয় ঐ কর্ম্ম গ্রহণে আপত্তি

করেন, বলেন যে, উহাতে তাঁহার ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাঘাত হইবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝাইয়া দেন, যে কলিকাতাই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। কি বিদ্যালোচনা, কি ব্যবসায় বাণিজ্য সর্ব্বপ্রকারের সুবিধা এক কলিকাতাতেই হইতে পারে। তাহা ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আবশ্যকমত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে কলিকাতা পুনরায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইল। এখানে তিনি কলেজে অধ্যাপকতা, বাসায় বৈদেশিক ছাত্রগণের অধ্যাপনা ও অন্য সময়ে আপনার বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৮৪০ সাল হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। ১৮৬২ সালে তাঁহার ব্যবসায়ে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হইল। তিনি এ ক্ষতি পূরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হইল। এখন তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে পতিত হইল। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের সূচনা হইল।

কলিকাতায় আসার কিছুকাল পর হইতেই অদ্ভুতকর্ম্মা বাচস্পতি মহাশয় অন্যান্য শত কষ্টের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সহজবোধ্য সুন্দর সংস্করণের প্রচলনের চেষ্টা করিতেছিলেন। রঘুবংশ ও কুমার-সম্ভবের মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রণ ও প্রচার এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রয়াস। ইহার পর তিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর সরলা নাম্নী টীকাও সেই সময়ে রচিত হয়। এই টীকা রচনা দ্বারা তিনি পাণিনির ব্যাকরণ সহজবোধ্য করিয়া জগতে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। যেখানে সংস্কৃত ভাষার আদর ও আলোচনা আছে সেখানে বাচস্পতিকৃত সরলানাম্নী টীকা সহিত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর আদর আছে। এতদিন অন্যান্য বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলন কার্য্যে সমগ্র মন দিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ব্যবসার ক্ষতি হওয়ার পর,

তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাত্মা কাউয়েল সাহেবের সুপরামর্শে তিনি লুপ্তপ্রায় ধ্বংসোন্মুখ সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথি হইতে বিভিন্ন পাঠের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কোথাও বা পাঠোদ্ধার করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, সাঙ্খ্য, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি তিনি মুদ্রণ ও প্রচার কবিতে লাগিলেন। কেবল মূলগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে এই বিবেচনায় তিনি ঐসকল গ্রন্থ সরল ও সহজ টীকা দ্বারা সুখবোধ্য করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার সুগমতা ও প্রচারের জন্য তিনি এতাবৎ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতেই জগতে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্কৃতশিক্ষিত সমাজে অমরতা লাভের জন্য তাঁহার ঐ সকল কার্য্যই যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল কীর্ত্তির অপেক্ষাও তাঁহার উজ্জ্বলতর কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। সেই অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহার বাচস্পত্য অভিধান।

বাচস্পত্য অভিধান সংস্কৃত ভাষায় মহাকোষ। ইংরাজিতে "এন্‌-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" বলিলে আমরা যাহা বুঝি সংস্কৃত ভাষায় বাচস্পত্য অভিধানও তাহাই। "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া" সঙ্কলন একটি অতি বৃহদ্ব্যাপার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ইংরাজী মহাকোষের সঙ্কলনের বিবরণে জানা যায় যে ঐ কার্য্যের জন্য রীতিমত আপিস গঠিত হইয়াছিল। সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সহায়ক এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ মহাকোষের বিভিন্ন বিষয় রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ বহু পণ্ডিত একত্র হইয়া একযোগে বহু বৎসর কার্য্য করিয়া ঐ বৃহদ্‌গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ঐ পণ্ডিতসমাজের রচিত এবং বহুবিত্তশালী প্রকাশকের প্রচারিত গ্রন্থ দেখিয়া এক্ষণে আমরা বিস্মিত হইতেছি। কিন্তু বাচস্পত্য অভিধান সম্বন্ধে ঐরূপ কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। এই মহাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেই পাঠক উহার কিঞ্চিৎ

আভাস পাইবেন। এই মহাগ্রন্থের আকার সম্বন্ধে এই বলিলেই হইবে যে চারি পৃষ্ঠাব্যাপী ফরমার আকারে ৫৬০০ পৃষ্ঠায় ঐ মহাকোষ সমাপ্ত হইয়াছে। উহার জন্য ৮০,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। উহা সঙ্কলন করিতে অষ্টাদশ বৎসর সময় লাগে। দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী সময়ে উহার মুদ্রণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। ইহাতে লৌকিক ও বৈদিক শব্দাবলী উদাহরণের সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে আর্হত গৃহ্যসূত্র, চার্ব্বাক, ন্যায়, পাশুপত, পাণিনি, পাতঞ্জল, প্রত্যভিজ্ঞ, মাধ্ব, মীমাংসা, শৈব, শ্রৌত, যোগাচার, রাসেশ্বর, বৈভাষিক, বৈশেষিক বেদান্ত দর্শনের পারিভাষিক শব্দ নিয়মের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অলঙ্কার কল্প গণিত ও জ্যোতিষ, তন্ত্র, বৈদ্যক, শিক্ষা, সঙ্গীত, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের এবং অষ্টাদশ পুরাণেরও অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ের বর্ণনা আছে। এই সকল বিবিধ বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ করাই অন্য যে কোন লোকের উদ্যম ও অর্থের এক প্রকার অসাধ্য। তাহার উপর এই সকল বিষয়ের মুদ্রিত অমুদ্রিত গ্রন্থরাজি স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করা ততোধিক দুঃসাধ্য। প্রথমতঃ তিনি এই কার্য্যের জন্য তাঁহার অনুগত কয়েকজন কৃতীছাত্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় অদ্ভূত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি পরকীয় সাহায্য গ্রহণ না করিয়া একাকী এতাদৃশ মহাকোষ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। এতাদৃশ সর্ব্বশাস্ত্রসংগ্রহ সংস্কৃত বিদ্যার দর্পণ স্বরূপ মহাকোষের উপযুক্ত প্রশংসাবাদের প্রয়াস আমাদের মত ক্ষুদ্রজনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি "তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ"। এবং তজ্জন্য ক্ষীণকণ্ঠে এবং কম্পিতকরে, দেশীয় যুবকগণকে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি ঃ—

সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
এক মনে ডাক ভগবান।
সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃ স্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।

যাঁহারা মানবচরিত্র বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহারা বলেন যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মহচ্চরিত্রের একটী প্রধান লক্ষণ। মহাপুরুষগণ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝেন তাহা সুচারুরূপে করিতে সতত প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কারণ, যাহা করিবার যোগ্য তাহা ভাল করিয়া করাই উচিত। অবস্থাচক্রে পড়িয়া জীবনে যখন যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, সম্পূর্ণ যত্নের সহিত করা আবশ্যক। য়ুরোপীয় এবং মার্কিণ জাতির মধ্যে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ পাদরী কেরী সাহেব এক সময়ে শ্রেষ্ঠ পাদুকাকার ছিলেন বলিয়া গৌরব করিতেন। মহামতি গারফিল্ড, মজুর, সূত্রধর, মাঝি, দ্বাররক্ষক, ঘড়িয়াল, শিক্ষক, ব্যবহারাজীব, সৈনিক এবং দেশপতির কর্ম্ম করেন। কিন্তু তিনি যখন যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া করিয়াছিলেন। ইহাই উন্নতির গূঢ় রহস্য। স্যর মথু-স্বামী আর্য্যের জীবনচরিত আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার চরিত্রে এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভাব সুন্দররূপে দেখিতে পাই।

অবস্থা-বিপাকে তাঁহাকে গ্রাম্যতহসীল আপিসে দ্বাদশবর্ষ বয়সে মাসিক এক টাকা বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কর্ম্ম সামান্য হইলেও তিনি সম্পূর্ণ যত্ন ও আগ্রহের সহিত তাহা করিতেন। যে কোন

কর্ম্ম তাঁহার হাতে পড়ুক না কেন, তিনি তাহা সুচারুরূপে এবং সর্ব্বাঙ্গীণ করিয়া সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। মথুস্বামীর জীবনচরিতে এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। গল্পটী এই ঃ—তিনি যখন তহসীল আপিসে কার্য্য করেন, তখন সেই তহসীলদারের অধীন একস্থানে একটী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তহসীলদার এই সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া আপিসে আসিলেন এবং বাঁধ ভাঙ্গার সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য দক্ষকর্ম্মচারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সময় সেরূপ কোন্ কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিল না। অগত্যা তহসীলদার বালক মথুস্বামীকে ঘটনাস্থলে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি অনিচ্ছার সহিত বালককে পাঠাইয়াছিলেন এবং যথাযথ সংবাদ পাইবেন বলিয়া তত আশাও করেন নাই। শেষে যথাসময়ে মথুস্বামী ঘটনাস্থল হইতে বাঁধভাঙ্গার সঠিক সংবাদ লইয়া আসিলেন। শুধু কয় হাত বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে বা কিরূপভাবে জলের বেগে নিকটস্থ পল্লীসমূহের অনিষ্ট হইতেছে এইরূপ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। বাঁধ মেরামত করিবার জন্য দ্রব্যাদি নিকটস্থ কোন্ পল্লীতে পাওয়া যায়, ঐ সংস্কার কার্য্যের জন্য কত লোকের প্রয়োজন এবং তাহা সেখানে সহজে পাওয়া যাইবে কি না, এ সকল সংবাদ যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তহসীলদার বালক মথুস্বামীর নিকট এরূপ সঠিক বৃত্তান্ত পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইহার পর মথুস্বামীর বর্ণিত বৃত্তান্তের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য তিনি একজন দক্ষকর্ম্মচারীকে সেখানে পাঠান। কর্ম্মচারী মথুস্বামীর লিখিত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ সত্য বলিলেন। তহসীলদার তদবধি বালকের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। তহসীলদার বুদ্ধিমান ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বালক মথুস্বামীর চরিত্রে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি বালকটীর কিসে মঙ্গল হয়

তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে মথুস্বামীও নিজের অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। মথুস্বামী যে আপিসে কর্ম্ম করিতেন, সেখানে মধ্যাহ্নে কোন কর্ম্ম হইত না। ঐ অবসর সময়ে তিনি নিকটস্থ একটী সামান্য বিদ্যালয়ে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। সেখানে অল্প কয় দিনের মধ্যে ইংরাজী বর্ণমালা শিখিয়া লয়েন। তহসীলদার তাঁহার শিক্ষানুরাগ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদবধি স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় একটী ঘটনা উপস্থিত হয়। তাহা হইতে মথুস্বামীর শিক্ষার সুযোগ ঘটিল। তহসীলদারের এক অল্পবয়স্ক ভাগিনেয় তাঁহার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে ছিল। একদিন তহসীলদার ভাগিনেয় ও মথুস্বামীকে একখানি প্রথম পাঠ ইংরাজী পুস্তক দিলেন এবং বলিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে কে এই পুস্তকের কতটুকু অভ্যাস করিতে পার দেখিব। সপ্তাহান্তে তহসীলদার দুজনের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং দেখিলেন ভাগিনেয় কয়েক পৃষ্ঠামাত্র পাঠ করিয়াছে কিন্তু মথুস্বামী সমগ্র পুস্তকখানি শেষ করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই তহসীলদার মথুস্বামীর উপর স্নেহশীল ছিলেন এক্ষণে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার এই নূতন নিদর্শন পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদবধি তিনি মথুস্বামীকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর মথুস্বামী উদরান্নের জন্য যে এক টাকা বেতনের কর্ম্ম করিতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলেন। তহসীলদার প্রথমতঃ মথুস্বামীকে নাগপত্তমে পাদরীদের স্কুলে শিক্ষার জন্য পাঠাইলেন। মথুস্বামী অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার পাঠ শেষ করিলেন। তহসীলদার তাঁহাকে আরও উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজে পাঠাইলেন ; এবং সেই সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ স্যর মাধব রাওকে একখানি অনুরোধ পত্র দিলেন। তাহাতে মথুস্বামীর শিক্ষার যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, তাহার কথাই ছিল। মথুস্বামীর অসাধারণ মেধা ও

পাঠানুরাগ দেখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সকলেই তাঁহার সুশিক্ষার জন্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়েই মথুস্বামী সুবিখ্যাত পাউয়েল সাহেবের অনুগ্রহভাজন হয়েন। বাঙ্গলা প্রদেশে ডেভিড হেয়ার ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের সাহায্য করিয়া যেমন প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, সেইরূপ মহাত্মা পাউয়েল সাহেব মান্দ্রাজ প্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের সহায়তা করিয়া তৎপ্রদেশবাসিগণের চির-কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মহাত্মা হেয়ার যেমন বালকগণের সহিত মিশিতেন, মহাত্মা পাউয়েলও তদ্রূপ ছাত্রগণের সহিত মিশিতেন এবং তাহাদিগকে আপনার বাসায় লইয়া গিয়া শিক্ষা ও সদুপদেশ দিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রে এরূপভাবে মিলিত হইলে অশেষ কল্যাণ হয়। সুশিক্ষা ও সুনীতি প্রচার সহজ হয়। আদর্শশিক্ষকের চরিত্র-প্রভাব কখনও বৃথা যায় না। মহাত্মা পাউয়েলের সৎগুণের প্রভাব মথুস্বামীর চরিত্রে প্রতিভাত হয়। মহাত্মা পাউয়েল মথুস্বামীর মেধা দেখিয়া তাঁহাকে 'অদ্ভুত বালক' বলিতেন ; এবং তাহার প্রতি একান্ত স্নেহশীল ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পর মথুস্বামীকে নিজের বাসায় লইয়া যাইতেন, সেখানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এমন কি তিনি কখন কখন স্বয়ং গাড়ী করিয়া মথুস্বামীকে তাঁহার বাসায় পঁহুছাইয়া দিতেন। মথুস্বামীও শিক্ষকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন। তিনি নানা পরীক্ষায় স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বহু পুরস্কার ও বৃত্তিলাভ করিতে লাগিলেন।

মথুস্বামী যখন মান্দ্রাজে শিক্ষালাভ করেন, তখন ভারতবর্ষের কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই সময়ে ১৮৫৪ খৃঃ অঃ মান্দ্রাজে একটী শিক্ষাসমিতি পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। এই সমিতি উৎকৃষ্ট ইংরাজী রচনার জন্য ৫০০ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন।

মথুস্বামী ঐ রচনার পরীক্ষা দেন। তাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি ঐ টাকা প্রাপ্ত হয়েন। মথুস্বামীর রচনা এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, একজন পরীক্ষক মুক্তকণ্ঠে মথুস্বামীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করেন। তাঁহার মতে মথুস্বামী য়ুরোপের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের গৌরবস্পর্দ্ধী হইবার উপযুক্ত। মথুস্বামী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর গভর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রশংসাপত্র পান। এইখানে তাঁহার পাঠ সমাপন হয়। ইহার পর তিনি ৬০৲ বেতনে শিক্ষকতা করেন। এই কর্ম্ম অল্পদিন করার পর তিনি তাঞ্জোরের কালেক্টরীতে মহাফেজের কর্ম্ম পান। ঐ কর্ম্মে তাঁহাকে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর স্যর আলেকজাণ্ডার আরবুথনট মথুস্বামীকে ১৫০৲ বেতনে ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। মথুস্বামী যখন যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তখন তাহাতে ভূয়সী প্রশংসা পাইয়াছেন। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি শিক্ষাবিভাগের উন্নতি-কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হয়েন। মথুস্বামী চিরকাল উন্নতিপ্রয়াসী ছিলেন। সদুপায়ে সুযোগ মত নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি যখন শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত তখন মান্দ্রাজ-গভর্ণমেণ্ট ওকালতী পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। মথুস্বামী দেখিলেন ওকালতী করিলে তাঁহার অধিক আয় হইবে। এই আশায় তিনি পরীক্ষার জন্য আইন পাঠ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মথুস্বামী পরীক্ষা দিলেন। বহু পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি সুখ্যাতির সহিত আইন পাশ করিলেন। ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন। মথুস্বামী মুন্‌সেফের পদপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি নূতন কর্ম্মে সহসা যোগ দিতে পারিলেন না। ডিরেক্টর সাহেব তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ

করিয়া যাইতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুস্বামী শিক্ষা-বিভাগে অল্পদিন কাজ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেন। মথু-স্বামীর কর্ম্মদক্ষতা ও প্রশংসা এক্ষণে তাঁহার উন্নতির প্রতিবন্ধক হইল। যাহা হউক বিচারবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ডিরেক্টর সাহেব মথুস্বামীকে মুন্‌সেফের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। মথুস্বামীর প্রধান প্রশংসার কথা এই যে, তিনি যখন যে কর্ম্ম করিতেন, তাহা সমগ্র প্রাণ মন দিয়া করিতেন। এই জন্য তাঁহার সকল কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। তিনি যখন মুন্‌সেফের কার্য্যে নিযুক্ত, তখন একবার তাঞ্জোরের জজ সাহেব তাঁহার আপিস পরিদর্শন করেন। আপিসের কাগজ পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও জজ সাহেব কোন ত্রুটি দেখিতে পান নাই। শেষে মথুস্বামী কিরূপে বিচার কার্য্য করেন, দেখিবার জন্য জজ সাহেব মুন্‌সেফ মথুস্বামীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার বিচার পদ্ধতি দেখিয়া জজ সাহেব এতই সন্তুষ্ট হয়েন যে, তিনি বলেন মথুস্বামী জজ হইবার উপযুক্ত পাত্র।

মথুস্বামী মুন্‌সেফের কার্য্য বেশী দিন করিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজ-গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে তাঁহাকে ১৮৫৯ সালে ডেপুটী কলেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই কর্ম্মও তিনি সবিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রাজস্বের কর্ম্মে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। ফৌজদারী আইনও তিনি সুন্দররূপে বুঝিতেন। মথুস্বামীর বিচারকার্য্য দেখিয়া সুবিখ্যাত নর্টন সাহেব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। মথুস্বামী ৬ বৎসর কাল ডেপুটী কলেক্টারের কাজ করেন। পরে ১৮৬৫ সালে সদর আলার পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই কর্ম্ম ৪ বৎসর করার পর তিনি মান্দ্রাজের পুলিস মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম স্থায়িভাবে প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি আইনের কূটতত্ত্ব সকল সবিশেষ

মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন। জ্ঞানার্জ্জনে ও পরীক্ষাদানে মথুস্বামী কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ইংরাজের ব্যবহার-শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে বুঝিবার জন্য তিনি জার্ম্মাণ ভাষা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মথুস্বামী চিরকাল অধ্যয়নশীল ছিলেন। পুলিস মাজিষ্ট্রেটের শ্রম-সাধ্য কর্ম্ম করিয়া তিনি ক্লান্ত হইতেন না। তিনি মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিয়া যে সময় পাইতেন তাহাতে বি, এল, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গুরু কর্ম্মভার, বা বয়স কিছুই তাঁহার উদ্যমের সমক্ষে বিঘ্নরূপে দাঁড়াইতে পারে নাই। তিনি যশের সহিত বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। মথুস্বামীর উন্নতির পথে আর কোন বাধা রহিল না। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মান্দ্রাজ ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি সি, আই, ই, উপাধি পান। মথুস্বামীর বিচারকার্য্যে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। ১৮৭৯ সালে মথুস্বামী আর্য্য হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, যিনি এক দিন সামান্য উদরান্নের জন্য গ্রাম্য হিসাবনবিশের নিকট এক টাকা বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, তিনি আজ মান্দ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি! পুরাণে ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য তপস্যার কথা শুনা যায়। মথুস্বামী আর্য্যের পক্ষে জজিয়তি লাভ ইন্দ্রত্বলাভের অপেক্ষা বড় কম নহে—এবং এজন্য তাঁহার সাধনাও নিতান্ত সহজ ছিল না।

শ্যামাচরণ সরকারের জীবন, বিচিত্র ঘটনাবলীতে পূর্ণ। শ্যামা-চরণের পিতা হরনারায়ণ সরকার পূর্ণিয়ার রাণী ইন্দ্রাবতীর দেওয়ান ছিলেন। হরনারায়ণ সরকারের সৌভাগ্যের সময় শ্যামাচরণের জন্ম হয়। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর দেওয়ানপুত্র শ্যামাচরণ সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েন। হরনারায়ণ সরকার অতিশয়

দানধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। দানধর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় ভিন্ন অর্থ সঞ্চয় তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। অন্যথা সাধারণের মত হইলে তিনি স্ত্রীপুত্রের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন। হরনারায়ণ ভগবানের কৃপায় একান্ত আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে জাহ্নবী-তীরে যখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হরনারায়ণ, স্ত্রীপুত্রের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছ?" তখন তিনি বলেন, "ধর্ম্ম আছেন, ভগবান আছেন, যে ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমার পুত্রকে রক্ষা করিবেন।" ভগবানের উপর নির্ভরশীলতার উৎকৃষ্টতর পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? হরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পূর্ণিয়ায় তাঁহাদের যে সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণনগরের সন্নিকট মামজোয়ানি গ্রামে আসিয়া স্বামীর পৈতৃক-গৃহে বাস করেন। পূর্ণিয়ার সম্পত্তিবিক্রয়লব্ধ টাকা এবং কিছু অলঙ্কারাদি শ্যামাচরণের মাতার নিকট ছিল। ইহা দ্বারা ও রাজা বিজয়গোবিন্দ-প্রদত্ত মাসিক বৃত্তির সাহায্যেই বিধবা রমণী পুত্রকন্যা কয়টী প্রতিপালন করিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বিধবার সম্বল চোরে লইয়া যায়। বিজয়গোবিন্দের বৃত্তি কিছু কাল পরে বন্ধ হয়। যে শ্যামাচরণের শৈশবে সুখের সীমা ছিল না, এখন বাল্যে তাঁহার অন্নকষ্ট উপস্থিত। দেওয়ানের পুত্র এখন বিধবার পুত্র—দুঃখে দারিদ্র্যে দিনপাত করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ যখন বালক তখন (লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলের পূর্ব্বে) পল্লীগ্রামে শিক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাহার উপর শ্যামাচরণ একপ্রকার অভিভাবকহীন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্যামাচরণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই, ব্যবস্থা করে কে? যাহা হউক এই সময়ে একটী সুযোগ ঘটে এবং সেই শুভক্ষণ হইতে শ্যামাচরণের জীবনের সাধনা আরম্ভ হয়।

কৃষ্ণনগরে হরচন্দ্র সরকারের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্যামাচরণের নিমন্ত্রণ হয়। শ্যামাচরণ যথাসময়ে আত্মীয়-গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধাদির কয়দিন গোলমালে কাটিল। তাহার পর একদিন হরচন্দ্র অবসর-সময়ে শ্যামাচরণের সংসারিক অবস্থার কথা ও তাঁহার লেখা-পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। হরচন্দ্র শ্যামাচরণের কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তেমন বুদ্ধিমান বালক লেখাপড়া শিখিতে পাইতেছে না জানিয়া ততোধিক দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, হরচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া শ্যামাচরণকে তাঁহার বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে বলিলেন; এবং তাঁহার জন্য ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। তখন দেশে পার্সী লেখাপড়া চলিত ছিল। পার্সী শিখিলে জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা হইত। হরচন্দ্র এই সব বিবেচনা করিয়া শ্যামাচরণকে শ্রীনাথ লাহিড়ী নামক জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির নিকট লইয়া যান। ইনি পার্সী উত্তমরূপে জানিতেন। শ্যামাচরণ ইঁহার নিকট পার্সী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামাচরণ হরচন্দ্রের বাটীতে দুবেলা আহার পাইতেন মাত্র; শ্যামাচরণের জন্য ইহার অধিক আর কিছু করিবার ক্ষমতাও হরচন্দ্রের ছিলনা। হরচন্দ্রের বাটীতে বাস ও আহার এবং শ্রীনাথ লাহিড়ীর নিকট বিনা বেতনে পাঠের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু পাঠ্য পুস্তক ও রাত্রিতে পাঠের জন্য তৈলের পয়সা জুটিল না। হরচন্দ্রের বাটীতে শ্যামাচরণকে যে সংসারিক কার্য্যে সাহায্য করিতে না হইত এমন নহে। দিনের বেলা পাঠের অবসর কম মিলিত। যাহাদিগকে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে মানসিক উন্নতিলাভ করিতে হয়, তাহাদিগের জন্য রাত্রি প্রশস্ত সময়। যখন অন্য সকলে নিদ্রাসুখে বিভোর তখন তাহারা কার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু দরিদ্র জন সে সময়েও আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারে না। আলোকের জন্য তৈলের প্রয়োজন। তৈলের জন্য পয়সা আবশ্যক। দরিদ্র ব্যক্তি

অনেক সময় সেই সামান্য পয়সাও সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্যামাচরণ পাঠ্য পুস্তক অনেক সময় অন্যের পুস্তক দৃষ্টে নকল করিয়া লইতেন ; এবং রাত্রিতে পাঠের জন্য চৌধুরী বাবুদের বৈঠকখানায় যাইতেন। সেখানে সমস্ত রাত্রি আলোক থাকিত। শ্যামাচরণ সেই অলোকে পড়িতেন। এইরূপে কৃষ্ণনগরে তিনি থাকিয়া সাত বৎসর লেখা পড়া শিখেন। এত দিন বিধবা মাতা কোনরূপে পল্লীগ্রামে সংসার চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর চলে না। সুতরাং শ্যামাচরণকে অর্থের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। শ্যামাচরণ পিতৃবন্ধু রিড্ সাহেবের কথা স্মরণ করিলেন। রিড্ সাহেব তখন কলিকাতা খিদিরপুরে থাকিতেন। শ্যামাচরণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রিড্ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার অধীনে দশ টাকা বেতনে একটী মুহুরীর কর্ম্ম দিলেন। শ্যামাচরণ ভাবিলেন দুঃখের দিন বুঝি অবসান হইল। উপার্জ্জিত অর্থে মাতার সাহায্য করিতে পারিবেন ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সে আনন্দ তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার কর্ম্ম গ্রহণের এক বৎসর কালের মধ্যেই রিড্ সাহেব ও তাঁহার অপর একজন কর্ম্মচারীর সহিত মোকদ্দমা হয়। তাহাতে শ্যামাচরণকে প্রভুর পক্ষে সাক্ষী দিবার কথা হয়। কিন্তু মোকদ্দমায় প্রভুই অপরাধী ছিলেন। এক্ষেত্রে পাছে চাকরীর অনুরোধে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হয়েন, এই ভয়ে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলেন। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া অপেক্ষা দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করা তিনি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। শ্যামাচরণ পুনরায় কষ্টে পড়িলেন ; কলিকাতার মত নগরে সহায়সম্পত্তিহীন হইয়া কোথায় যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। শেষে কৃষ্ণনগরের পরিচিত বন্ধু সত্যপরায়ণ রামতনু লাহিড়ীর বাসায় যাওয়াই স্থির করিলেন। রামতনু লাহিড়ী ও তাঁহার দুটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন পটলডাঙ্গায় বাসা করিয়া থাকেন ও হিন্দুকলেজে পড়েন।

রামতনু শ্যামাচরণকে সাদরে বাসায় স্থান দিলেন। লাহিড়ীদের বাসায় দাসদাসী বা পাচকের কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। বাসায় পাক করা, বাজার করা, জল আনা প্রভৃতি কর্ম্ম তাঁহারা সকলে মিলিয়া করিতেন। বাসার কার্য্যের শ্রমবিভাগে শ্যামাচরণের উপর গোলদীঘি হইতে জল আনার ভার ছিল। শ্যামাচরণ শারীরিক পরিশ্রমে কখনও কাতর বা লজ্জিত হইতেন না। ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্বই প্রকাশ পাইয়াছিল।

লাহিড়ীদের বাসায় অবস্থানকালে তিনি আপনার চেষ্টায় ও বন্ধুবর্গের সাহায্যে সাহেবদিগকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই অর্জ্জিত অর্থ হইতে তিনি মা ও ভগিনী দুইটীর ভরণপোষণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই কর্ম্মে তাঁহার মাসিক ত্রিশ টাকা আয় হইল। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা চির-কালই প্রবল ছিল। তিনি ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। প্রথমে স্বনামপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের নিকট তিনি ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার পর ভাল করিয়া ইংরাজী ভাষা শিখিবার মানসে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইতে যান। কিন্তু তাঁহার বয়স বেশী হওয়ায় তিনি সেখানে ভর্ত্তি হইতে পারিলেন না। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর। শ্যামাচরণ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভগ্নোদ্যম হইবার পাত্র ছিলেন না। শ্যামাচরণ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রাতে পড়িবার বন্দোবস্ত করিলেন। এবং আপনার সেই সামান্য ত্রিশ টাকা হইতে মাসিক আট টাকা বেতন দিয়া তিনি ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সাহেব অধ্যাপকগণের নিকট তিনি ইংরাজী ছাড়া, গ্রীক, লাটীন ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময়ে শ্যামাচরণ মাদ্রাসায় একটী স্থায়ী কর্ম্ম পান। কর্ম্মটীর বেতন ২৫ টাকা। কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামাচরণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায়

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতন ৪০৲ টাকা করিয়া দিলেন। অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁহার পাঠানুরাগ দেখিয়া এত প্রীত হয়েন যে তাঁহার পাঠের সুবিধার জন্য মাদ্রাসায় প্রাতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সাহেবদের কৃপায় শ্যামাচরণের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

শ্যামাচরণের জীবনের এই সময়ের ইতিহাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কাহিনীতে পূর্ণ। তাঁহার পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কথিত আছে এইসময়ে তিনি প্রাতে ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। তাহার পর অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠ করিতেন। ইহার পর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিতেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার দুসন্ধ্যা যথারীতি আহার হইত না। অতি প্রত্যূষে স্বহস্তে রন্ধন এবং আহার করিয়া মাদ্রাসায় যাওয়া সুবিধা হইত না। এইজন্য তিনি রাত্রিতে পড়াইয়া আসিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং প্রাতের জন্য রুটী তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। প্রাতে সেই রুটীই তাঁহার প্রধান আহার ছিল। এইরূপে তিনি পাঁচ বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেন। এইখানে বলা আবশ্যক যে রামতনু বাবুদের বাসায় দুই বৎসর অবস্থানের পর শ্যামাচরণের অবস্থা একটু ভাল হইলে তিনি ঠন্ঠনিয়ায় স্বতন্ত্র বাসা করেন। মাদ্রাসায় পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর তিনি সংস্কৃত কলেজে ৭০৲ বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি যখন মাদ্রাসায় কর্ম্ম করেন, তখন তথাকার সুশিক্ষিত মৌলভীগণের সাহায্যে তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত আরবী পারসী ও উর্দ্দূ ভাষার জ্ঞান বর্দ্ধিত করেন। এখন আবার সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায়গণের সংসর্গে আসিয়া তিনি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি অল্প

সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি হয় নাই। এক্ষণে তিনি জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণের নিকট স্মৃতি শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। বিবিধ ভাষায় এবং শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের জন্য শ্যামাচরণের সাধনায় এইখানে এক প্রকার শেষ হয়। ইহার পর আমরা তাঁহাকে অপরত্র ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে রত দেখিব।

শ্যামাচরণের নির্ম্মল চরিত্র, বহুভাষাজ্ঞান, অসাধারণ শ্রমশীলতার জন্য তিনি শিক্ষাবিভাগের লোকের প্রশংসাভাজন হইলেন। এই সময়ে তিনি ব্যবহারাজীব হইবার জন্য ইচ্ছা করেন। কিন্তু ভাগ্য-দেবতার কোন অজ্ঞাত নির্দ্দেশে তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই। যাহা হউক শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর সুপারিসে শ্যামাচবণ তদানীন্তন সদর আদালতের প্রধান বিচারপতির অধীনে পেশকারের কর্ম্ম পাইলেন; এই পদের বেতন ১০০৲ টাকা। শ্যামাচরণ এতদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছিলেন। আপিস আদালতের কর্ম্মের কোন জ্ঞান তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাকে কোন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সম্মুখে পেশকারের কর্ম্মের নূতনত্ব বেশী দিন রহিল না। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নূতন কর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিলেন। এতাবৎকাল যেরূপ পদ্ধতিতে পেশকারের সাহায্যে বিচারকগণ মোকদ্দমার কাগজপত্র বুঝিতেন তাহাতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে অযথা অনেক সময় লাগিত। শ্যামাচরণের উপরিতন কর্ম্মচারী সাহেব, কি উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র শীঘ্র মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারা যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন; এই উপলক্ষে শ্যামাচরণ মোকদ্দমার কাগজপত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া সাহেবকে দেন। মোকদ্দমা-সংক্রান্ত দেশীয় ভাষায় লিখিত

কাগজপত্রের সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ পাইয়া সাহেব অতি সহজে সুবিচার করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে সদর আদালতের জজগণ এই প্রকার অনুবাদপ্রথার উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের সমর্থনে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ড্যালহৌসী ৪০০৲ টাকা বেতনে আদালতে একজন অনুবাদক নিযুক্ত করিতে অনুমতি দেন। এই নূতন কর্ম্মে শ্যামাচরণ প্রথমে নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে তদবধি সমস্ত জেলার আদালতে এক এক জন অনুবাদক নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয়। অনুবাদকের পদ হইতে ক্রমে শ্যামাচরণ সদর আদালতের প্রধান দ্বিভাষীর পদে উন্নীত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে এই কর্ম্মে কোন দেশীয় লোক নিযুক্ত হয়েন নাই। শ্যামাচরণ বিষম প্রতিযোগিতার মধ্য হইতে এই পদ লাভ করেন। কঠোর সাধনদ্বারা তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়কেই প্রীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৮৭৩ খৃঃ অঃ শ্যামাচরণ সরকারী কার্য্য হইতে ৩০০৲ টাকা পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যে উৎকট সাধনা করিয়াছিলেন ভগবানের কৃপায় তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের জীবনের সাধনপ্রসঙ্গ মুখ্যতঃ এইখানে শেষ।

আমাদের জাতীয় বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল মহাত্মা দেহমন ক্ষয় করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত এক-জন। বাঙ্গালা ভাষাকে তেজস্বিনী করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়া অক্ষয়কুমার বঙ্গদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা কোনপ্রকার গম্ভীর বিষয়ের উপযুক্ত শব্দের অভাব বাঙ্গালা ভাষায় পরিলক্ষিত হইত। অক্ষয়কুমার আত্মপ্রাণ দিয়া বঙ্গভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় উন্নতি তাঁহার

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি শৈশবকাল হইতে জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। এবং আজীবন কাল সেই জ্ঞানলাভ ও স্বদেশে তাহার বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের অসাধারণ সাধনপ্রসঙ্গের আভাস পাইতে হইলে তাঁহার জীবনের স্থূল স্থূল কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করা আবশ্যক। সেই ঘটনা পরম্পরা হইতে তাঁহার সাধনার কঠোরত্ব বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

অক্ষয়কুমারের শৈশবকালে দেশের শিক্ষাপ্রণালী অন্যরূপ ছিল। তখন আদালতে, সরকারী কাছারীতে পারসীর সমধিক প্রচলন ছিল। চাকরী ব্যবসায়ী কায়স্থসন্তান যাহাতে কোন ভাল কর্ম্ম পান, সেই আশায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রথমে পারসী পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সময়ে দেশে অল্পে অল্পে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু তৎকালে ইংরাজী শিক্ষা প্রায়ই পাদরী সাহেবদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এবং যাহারা পাদরীদের নিকট পড়িত, তাহাদের মধ্যে অনেকে সমাজদ্রোহী, আচারভ্রষ্ট বা খ্রীষ্টান হওয়াতে সাধারণ লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ইংরাজী শিখিলেই যুবকেরা খ্রীষ্টান হইবে অথবা সমাজদ্রোহী, উচ্ছৃঙ্খল বা আচারভ্রষ্ট হইবে, সন্ধ্যাতর্পণ সকলই ত্যাগ করিবে। পিতৃপুরুষগণ পিণ্ড জল পাইবেন না। এই সংস্কার থাকায় অক্ষয়কুমারের পিতা তাঁহাকে প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা দিতে সাহস করেন নাই। শিক্ষার প্রথম অবস্থায়, তদানীন্তন প্রথা ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাঁহার পিতার বিরুদ্ধসংস্কার, অক্ষয়কুমারের সুশিক্ষার প্রবল অন্তরায় হইয়াছিল। কিরূপে তিনি নিজের চেষ্টায় এই বাধা অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। অক্ষয়কুমারের মন শৈশব-কাল হইতে অনুসন্ধিৎসু ছিল। তত্ত্বজিজ্ঞাসু বালকের বিবিধ প্রশ্নে গ্রাম্য গুরুমহাশয় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। তিনি অক্ষয়কুমারের "বাজে

কথায়” কাণ না দিয়া তাঁহাকে দলিল, দস্তাবেজ, আর্‌জি, পাট্টা, কোবলা লেখার পদ্ধতি, শুভঙ্করের মানসাঙ্কের প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে বলিতেন। অক্ষয়কুমারের জ্ঞানের তৃষ্ণা ইহাতে মিটিত না। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকাদি পাইলে তিনি আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। এই অবস্থায় পিয়ার্স‌ন সাহেবের অনুবাদিত বাঙ্গালা ভূগোল তাঁহার হস্তে আসে। পাঠান্তে অক্ষয়কুমার আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। পৃথিবীর আকার ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে পৌরাণিক যে সকল ধারণা ছিল, তাহা দূর হইল। তিনি সেই অল্পবয়সেই বুঝিলেন ইংরাজী ভাষা কি অনন্ত রত্নের আকর। তদবধি তিনি ইংরাজী শিক্ষার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পিতা ও অপরাপর কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া বলাতে এবং তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করাতে তাঁহারা অক্ষয়কুমারকে কোন পাদরীর স্কুলে ভর্ত্তি হইতে অনুমতি দেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার পাঠ বেশী দিন হয় নাই। মিশনরী স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি আড়াই বৎসর কাল মাত্র গৌরমোহন আঢ্যের সুবিখ্যাত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঠ করেন। বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ তাঁহার এই পর্য্যন্ত। এই সময় তাঁহার বয়স সতর আঠার বৎসর হইবে। সাংসারিক নানা দুর্ঘটনায় বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা লাভ ঘটিল না সত্য, কিন্তু যে অল্প সময় তিনি বিদ্যালয়ে ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার জ্ঞানের প্রতি এরূপ অনুরাগ জন্মে যে উত্তর-জীবনে নানা দুঃখে কষ্টে. সুখে সম্পদে বা রোগে শোকে কিছুতেই তাহা কমে নাই। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি বিদ্যালয়ে শিক্ষার একটী অন্যতম উদ্দেশ্য। কিরূপে জ্ঞানান্বেষণ করিতে হয়, কিপ্রকারে স্বাধীনভাবে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, এ সকল কথা বিদ্যালয়ে সুশিক্ষক শিখাইয়া দেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি ঐ দুটী তাহাদের অন্যতম হয়, তবে অক্ষয়কুমারের বিদ্যালয়ে স্বল্পকালব্যাপী অধ্যয়ন নিশ্চয়ই

সার্থক হইয়াছিল। উত্তরজীবনে তিনি জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণের শিক্ষার বিষয়। অধুনা দেখা যায় আমাদের দেশের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রায়ই পুস্তক স্পর্শ করেন না। এইজন্য বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণের শিক্ষার অসারত্বের এত নিন্দা শুনা যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া স্বাধীনভাবে পাঠ ও চিন্তা আমাদের দেশে এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য আমাদের দেশে শিল্প, বিজ্ঞান বা সাহিত্যক্ষেত্রে মৌলিক কার্য্য অতি বিরল।* অনেকে বলেন যে, ইউরোপীয় ও মার্কিণ এবং অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত উপাধিধারী যুবকগণের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, আমাদের দেশে যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন ত্যাগ করেন আর ইউরোপীয় ও মার্কিণ যুবকগণ উপাধি গ্রহণান্তর যথারীতি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কথাটী খুব সত্য। অক্ষয়কুমার যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার বিদ্যালয় ত্যাগের পর স্বাধীন পাঠ ও স্বাধীন চিন্তার বলে।

যে অবস্থাবিপাকে পড়িয়া তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন তাহা প্রায় সচারাচর লোকের ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেইরূপ দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়া আত্মোন্নতির জন্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য, বাঙ্গালী সমাজের জন্য অক্ষয়কুমার যাহা করিয়াছিলেন তাহা সচরাচর লোকে করে না। অন্যথা আমরা অনেক অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম। অক্ষয়কুমারের বয়স যখন ১৭।১৮ বৎসর, তখন তাঁহার স্কন্ধে সংসারের

* সুখের বিষয় আমাদের সুযোগ্য রাজপুরুষগণ ও বিশ্ববিদ্যালযের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অভাব দূরীকরণের জন্য রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী, এম, এ; এম, ডি, এবং এম, ই, উপাধিধারীগণের মৌলিক গবেষণাদির জন্য নূতন নিয়ম ও বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আশা করা যায় কালে ইহাতে দেশের কল্যাণ হইবে।

ভার পড়িয়াছিল। তিনি নানা স্থানে চাকরীর জন্য ঘুরিয়াছিলেন। সহায়বিহীন হইয়া অভাবের গুরুভার শিরে লইয়া উমেদারী করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই অবস্থায় যুবকগণ জীবনে যত অবসাদ অনুভব করে, অন্য সময় বোধ হয় তত করে না। তাহারা শিক্ষামন্দিরে একটা স্থিরতার মধ্যে আশান্বিত থাকে। সংসারের যে চিত্র পঠদ্দশায় অঙ্কিত করিয়া থাকে বিদ্যালয় ত্যাগের পর যুবকগণ তাহা কদাচিৎ দেখিতে পায়। এইখানেই ত পার্থক্য। তাহার পর সংসারে প্রবিষ্ট হইলে, সাংসারিক ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রায়ই পাওয়া যায় না। প্রতি-যোগিতা সেখানে অত্যন্ত বেশী, তাহা ছাড়া ঈর্ষা, দ্বেষ, অসূয়া, অন্যায়া-চরণ প্রভৃতির ত কথাই নাই। অক্ষয়কুমার এ সকল উপদ্রব ও অসুবিধার বাহিরে ছিলেন না। তিনি দৈনিক পরিশ্রমের পর যখনই অবসর পাইতেন তখনই দেবী সরস্বতীর আরাধনা করিতেন। প্রকৃত ভক্তের ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং আগ্রহের সহিত তিনি বিদ্যাচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি পরকীয় সাহায্য ব্যতিরেকে, একমাত্র স্বাবলম্বনের গুণে বহুবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়েন। বিদ্যালয় ত্যাগের কিছুকাল পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় আট টাকা বেতনের শিক্ষকতার কার্য্য পান। কর্ম্মটী অল্প বেতনের হইলেও উহা তাঁহার পক্ষে যেমন উপস্থিত তীব্র অভাব প্রশমনের উপায় হইয়াছিল, তেমনই তাহা তাঁহার উত্তর-জীবনের সৌভাগ্য-সোপানের প্রথম স্তর হইয়া-ছিল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার সংস্রবে আসিয়া তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পণ্ডিতের কার্য্য তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই ঐ পত্রিকার সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্যা অর্জ্জন ও বিদ্যা দান করা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বাল্যে এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সমধিক সুবিধা ও সুযোগ ঘটে নাই। যৌবনের

প্রারম্ভে অন্নচিন্তায় সতত ক্লিষ্ট থাকিলেও তিনি অবসর পাইলেই বিদ্যালোচনা করিতেন। ইহার পর তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয় পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আর অন্নচিন্তায় মুহ্যমান থাকিতে হইত না। সুতরাং এক্ষণে তিনি একান্ত-চিত্তে জ্ঞান সাধনায় রত হইলেন। পুস্তকাদির আর তাঁহার অভাব রহিল না। রুচি অনুযায়ী বিবিধ পুস্তক প্রচুর পরিমাণে পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অক্ষয়কুমার ইংরাজী দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা করেন। অধিক কি রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা সম্যক্ রূপে শিক্ষা করিবার মানসে তিনি দুই বৎসর কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ মেডিকেল কলেজে ছাত্রের ন্যায় অধ্যাপকগণের নিকট ঐ দুই বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তিনি এক্ষণে অহোরাত্র অবিশ্রান্ত বিদ্যা-লোচনায় ব্যস্ত রহিলেন। এইরূপে তিনি দ্বাদশ বর্ষকাল সাধনা করেন। ইহার পর তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। দৈহিক ক্ষুধার ন্যায় মানসিক ক্ষুধা আছে। শারীরিক শক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উভয়বিধ ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করা উচিত। শরীরকে উপেক্ষা করিয়া মনের উন্নতি কিংবা মনকে উপেক্ষা করিয়া শারীরিক উন্নতি করিতে গিয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে, প্রকৃতির প্রতিকূলে যাইলে, প্রকৃতি প্রতিশোধ লইয়া থাকে। অক্ষয়-কুমার সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। তিনি শরীর ও মনকে অতিমাত্রায় খাটাইয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে দুরারোগ্য শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার ৬৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ৩১ বৎসর কাল ঐ কষ্টদায়ক পীড়ায় জীবন্মৃত হইয়া কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, অনেকে সুস্থদেহে ও সুস্থমনে তাহা করিতে পারেন না। ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক দুই

খণ্ড বৃহৎগ্রন্থ তাঁহার পীড়িত অবস্থায় রচিত। অবশ্য এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের অনেকাংশ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন ঐ সকল একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন তিনি শিরোরোগে পীড়িত। ঐরূপ অবস্থায় গ্রন্থখানিকে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইলে কিরূপ আগ্রহ, সঙ্কল্প ও সাধনার প্রয়োজন, তাহা যাঁহারা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা বুঝিতে পারেন। কি অবস্থায় ও কতকষ্টে ঐ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের দুই খণ্ড রচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। "শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা কি বলিব? না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থ-শ্রবণ, কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক কষ্ট হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এভাগের কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন, যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটিবারও নেত্রপাত করিতে পারি নাই। অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ়-ভাব-সম্বলিত চিন্তাপ্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশ্যে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-স্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয় ততক্ষণ মস্তকমধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে যান-বাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধুবিশেষের সমীপে গমনপূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার ষত্ব ণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্য্যমাণে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দ্ধ রাত্রের নিদ্রাকাতর

কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কতবিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে, নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া, সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এইরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট ; নিজে দূরে থাকুক, অন্য দ্বারা তাহা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট। এবং যে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশে কোন গ্রন্থাদি অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনেও যে সে সময়ে শুনিতে পারি ? না সমুচিত মনঃ সংযোগ করিতে সমর্থ হই ? শরীরের অবস্থা অনুসারে দিন বিশেষে ও সময় বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পঙ্ক্তি কখন দুই চারি পঙ্ক্তি, দুই চারিটী বা দুই একটী শব্দ মাত্র, কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া উপাসক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদয় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পরপর লিখিত হয় পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন্ বাক্যটি কোন স্থানে বা কোন বাক্যেরপর বিনিবেশিত হইবে উক্ত রূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময় তাঁহার কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদয় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট। পূর্ব্বোক্ত রূপে শরীরের অবস্থানুসারে দিন বিশেষে ও সময় বিশেষে তখন ঔষধ-বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহুকষ্টে কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।"* রচিত গ্রন্থের আকার ও বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব ও পারিপাট্যের আর রচয়িতার দুরারোগ্য নিরতিশয় কষ্টদায়ক পীড়ার

* [ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা ২৭৫ ও ২৭৬ পৃঃ]

বিষয় যখন চিন্তা করা যায় তখন অক্ষয়কুমারের ইচ্ছাশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। ধন্য তাঁহার সঙ্কল্প আর ধন্য তাঁহার সাধনা।

বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত আলোচনা করিলে, সাহিত্যসাধনায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। পরধর্ম্ম গ্রহণ, পরকীয় বেশ পরিধান, পিতামাতা ও সমাজত্যাগ ইত্যাদি অনেকগুলি ভুল তিনি করিয়াছিলেন। এগুলি তাঁহার অনিয়ন্ত্রিতা বিপথগামিনী ইচ্ছাশক্তিরপরিচয় মাত্র। আমরা মধুসূদনের সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনের কথা এখানে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করিব না। তাহার আবশ্যকতাই নাই। মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের কথা আলোচনা করিব। এবং দেখিব সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কিরূপ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি ইচ্ছাকে (ঈপ্সা) পর্ব্বত-দুহিতা নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক তুলনাটী বড়ই মনোজ্ঞ।

মধুসূদনও স্বয়ং বলিয়াছেন—

"—পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?"

সেই স্রোতস্বিনী সম্মুখে বাধা পাইলে কোথাও পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও বা তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভীমকান্ত জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া পুনরায় অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হয়। মধুসূদনের অনন্তরত্ন-প্রভব শিরোদেশ-সম্ভূত ইচ্ছাশক্তি সাহিত্যের উদ্দেশে যাইবার সময় এইরূপে কোথাও বাধা সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে কোথাও বা প্রবল বাধা পাইয়া পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে কোথাও বা প্রবলতর বাধা পাইয়া ক্ষণিকের জন্য স্থির হইয়া, শক্তিসঞ্চয় করিয়া বর্দ্ধিতকলেবর

হইয়া তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সুন্দর সুন্দর খণ্ডকাব্য মহাকাব্যরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ চিত্তরঞ্জন জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। মধুসূদন আজীবন দেবী সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। কিরূপ মহীয়সী সাধনা দ্বারা তাঁহার প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমে বলিতেছি।

মধুসূদন তদীয় "জন্মদাতা দত্তমহামতি রাজনারায়ণ" এবং "জননী জাহ্নবীর" একমাত্র আদরের সন্তান। যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে রাজনারায়ণ দত্ত সঙ্গতিপন্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পল্লীগ্রামের বিষয়বিভব ছাড়া ইনি কলিকাতার সেকালের সদর আদালতের একজন বিশিষ্ট উকীল ছিলেন এবং ওকালতী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। মধুসূদনের জননী জাহ্নবীও সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুহিতা ছিলেন। এমন পিতা মাতার একমাত্র পুত্র যে অতিশয় আদরের হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? মধুসূদন দ্বাদশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাগরদাঁড়ীতে ছিলেন। সেইখানে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু-মহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। যে বয়সে ও যেরূপ আদর পাইলে ধনীর সন্তান "আলালের ঘরের দুলাল" হইয়া লেখা পড়া করে না, মধুসূদন সেই বয়সে সেইরূপ অথবা তাহার অপেক্ষা অধিক আদর পাইয়া এক দিনের জন্য লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার ঐকান্তিক বিদ্যানুরাগ ও অলৌকিক প্রতিভা এবং প্রখরা স্মৃতিশক্তির জন্য তিনি পঠদ্দশায় সর্ব্বত্র শিক্ষকের স্নেহ ও প্রশংসার পাত্র ছিলেন। গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের তাড়না বেত্রদণ্ড, 'ইটেখাড়া' 'জলবিছুটী' অন্যান্য সহপাঠিগণের বিদ্যালাভের প্রতি ভীতি বা বৈরাগ্যের কারণ হইলেও মধুসূদন ঐ সকল কারণে কোনও দিন পাঠশালায় অনুপস্থিত হইতেন না বা অনিচ্ছায় গমন করিতেন না। অধিকন্তু শুনা যায় তিনি আহারান্তে সর্ব্বাগ্রে পাঠশালায় উপস্থিত হইবার মানসে "ক্ষীর সর

ননী” প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদ খাদ্য এবং ঐ সকল আহারের জন্য পুত্র-বৎসলা জননীর সস্নেহ আহ্বান উপেক্ষা করিতেন। শৈশবে মধুসূদনের পাঠানুরাগ এমনই প্রবল ছিল। ইহার পর তাঁহার যখন ত্রয়োদশ বৎসর বয়স, তখন তিনি কলিকাতায় আসেন এবং খিদিরপুরে পিতার নিকট থাকিয়া কিছুদিন খিদিরপুরের কোন স্কুলে পড়েন এবং পরে হিন্দু কলেজে প্রেরিত হয়েন। ১৮৩৭ সাল হইতে ১৮৪২ সাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি ইংরাজী বর্ণমালা হইতে সিনিয়র বিভাগের শেষ পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পাঠ করেন। মধুসূদনের পঠদ্দশায় এখনকার ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপাধিপরীক্ষা ছিল না। তবে শুনা যায় যে সিনিয়র বিভাগের শেষ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকগুলি বর্ত্তমান সময়ের বি, এ, কোর্সের সমতুল্য ছিল। ছয় বৎসরে ইংরাজির এ, বি, সি, হইতে আরম্ভ করিয়া, বি, এ, কোর্স পর্য্যন্ত প্রশংসার সহিত অধ্যয়ন করার কথা শুনিলে এখন আমাদের বিস্ময় জন্মে। স্বতঃই কয়েকটী প্রশ্ন মনে হয়—তখনকার শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ ছিল, শিক্ষকগণই বা কেমন ছিলেন, আর যে ছাত্র এইরূপ পাঠ সমাপন করিতে পারেন, তাঁহার মেধা ও সাধনা কিরূপ ছিল? একে একে একথাগুলির আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষাপ্রণালী কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা ‘পরীক্ষাপ্রধান’। পরীক্ষকের প্রশ্নগুলির কিয়দংশের উত্তর দিতে পারিলে এখন পারদর্শী বলিয়া প্রশংসা পাওয়া যায়। পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষাপ্রণালীর মূলোদ্দেশ্য হিতকর হইলেও কালে তাহার অপব্যবহার হইতেছে। শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষাপ্রধান হওয়াতে প্রশ্নোত্তরের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্র দেখেন যে, কোন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক বিশেষে কত প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে। এই সকল প্রশ্নের অধিক সংখ্যকের উত্তর দিতে

পারিলেই পরীক্ষায় পাশ হওয়া যায় এবং প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এই বিবেচনায় শিক্ষক ও ছাত্র পুস্তক অধ্যাপন ও অধ্যয়ন কালে প্রশ্নোপযোগী অংশ গুলি পেন্সিল দ্বারা চিহ্নিত করিয়া যান। এবং সেই সকল অংশই ছাত্রেরা শুকের ন্যায় কণ্ঠস্থ করেন। বর্ত্তমান সময়ে সম্ভাবিত প্রশ্ন-নির্ব্বাচন, কৃতী শিক্ষকের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ছাত্রগণ পরীক্ষা-মন্দিরে কণ্ঠস্থবিদ্যা উত্তরের কাগজে উদ্গিরণ করিয়া আসেন। অনেকে এইরূপ কার্য্যকে বমন ক্রিয়ার সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা বলেন যেমন খাদ্য দ্রব্যের পরিপাক হওয়া আবশ্যক, অন্যথা বলাধান হয় না, সেইরূপ অধীত বিদ্যা চিন্তার দ্বারা আত্মগত না করিলে বিদ্বান হওয়া যায় না। ভুক্ত দ্রব্যের বমন ও কণ্ঠস্থ বিদ্যার আবৃত্তি উভয়ের তুল্য মূল্য। উপমাটী কাহার কাহার নিকট ঘৃণাকার-জনক বোধ হইলেও উহা যে এক বারে অসত্য বা অসঙ্গত, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকের প্রশ্ননির্ব্বাচনের সাহায্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস ত আছেই। তাহা ছাড়া বাহিরে অর্থপুস্তক "আদর্শ-প্রশ্নোত্তর" ইত্যাদির প্রভাবও কম নহে। অর্থপুস্তক-রচয়িতা অর্থপুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিশ্রম সার্থক করেন সত্য, কিন্তু প্রায় অনেক স্থলেই ঐ প্রকার বহু অর্থপুস্তক ক্রয় করিয়া কত ছাত্রের কত যে অনর্থ ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিয়াছে? বাস্তবিক ব্যাখ্যা-পুস্তকের বাহুল্যে মূল বিষয়ের আলোচনা কমিয়াছে। একজন সুলেখক বলেন যে "ব্যাখ্যাপুস্তকগুলি দেবগৃহের ধূমোদ্গারী প্রদীপের ন্যায়; উহাতে আলোকের অপেক্ষা ধূমোদ্গার হেতু অন্ধকারই বেশী হয়। বিগ্রহের মূর্ত্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়।" বাস্তবিক ঐ প্রকার ব্যাখ্যাপুস্তক ও টীকা টিপ্পনীর সাহায্যে বাগ্দেবীর অমল ধবল কান্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সরল ভাষায় বলিতে গেলে, নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্নোত্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধ্যয়ন

করায় স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তা কমিতেছে, জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অনুরাগ কদাচিৎ বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা হউক সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের সুযোগ্য রাজপুরুষগণ এবং স্বদেশ হিতৈষী চিন্তাশীল বিদ্বৎ-সমাজ দেশের শিক্ষার এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। *

মধুসূদন দত্ত যখন হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন তখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী অন্যরূপ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন এত পরীক্ষা-ভীতি ছিল না। ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকগণ সতত প্রয়াস পাইতেন। তাঁহারা ছাত্রগণের চিন্তাশক্তি, ভাবগ্রাহিতা এবং রসজ্ঞতা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি এবং রাজনীতির দোষগুণ ছাত্রগণের সহিত বিচার করিয়া ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত করিতেন। এবং ঐ সকল বিষয়ের শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় অংশ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। সেই সকল সুশিক্ষকগণ সাহিত্যালোচনার কালে ছাত্রগণের সমক্ষে মানব-হৃদয়ের বৃত্তিগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অন্তর্ভূত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দিতেন; তাঁহাদিগকে ভাবুক ও রসজ্ঞ করিতে চেষ্টা করিতেন। সেই সুশিক্ষকগণ সৃষ্টি-রহস্য দেখাইয়া স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশল দেখাইতেন। তারকা-শোভিত নীল নভোমণ্ডল, প্রশান্ত নীল নীরধি, তুষার-মণ্ডিত গগনস্পর্শী গিরিরাজের বর্ণনায় স্রষ্টার সৌম্য মূর্ত্তি অনুভব করিতে বলিতেন। কঠোর বজ্রের শ্রবণ-ভৈরব নির্ঘোষে, খণ্ডপ্রলয়কারী প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে, তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে বলিতেন। সুকুমার

---

* মহাত্মা লর্ড রিপণের এডুকেশন কমিশন, পেডলার সার আলেকজাণ্ডারের নূতন শিক্ষাপদ্ধতি এবং লর্ড কার্জ্জনের ইউনিভারসিটী কমিশনের কথা এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিশুর বিমল হাস্যে, শিশির-স্নাত ঈষদ্ভিন্ন কোরকে, ফুল্ল ফুলে, স্নিগ্ধ সলিলে, শীতল বায়ুহিল্লোলে, তাঁহার করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে শিক্ষা দিতেন। পাঠ্য পুস্তকের বর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্জগত ও বহির্জগতের দৃশ্যের সহিত কি প্রকারে মিলাইয়া পাঠ করিতে হয়, কিরূপে তাহার রসাস্বাদ করিতে হয় তাহা তৎকালের সুশিক্ষকগণ যত্নের সহিত বলিয়া দিতেন। শিক্ষকগণের সুন্দর অধ্যাপন-প্রণালী ছাড়া তখনকার শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের সহিত সহৃদয় ব্যবহার করিতেন। ছাত্রগণের শুভ চেষ্টায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতেন। ছাত্রগণের সহিত শিক্ষকগণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বর্ত্তমান সময়েও অনেক দেবপ্রকৃতি আদর্শ শিক্ষক আছেন। তাঁহারা না থাকিলে দেশের শিক্ষার অবস্থা যে কিরূপ হইত বলা যায় না। তবে, নানা কারণে এইরূপ সুশিক্ষ-কের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। সে কালে শিক্ষকগণ কৃতী উদ্বিদ্‌বিদের ন্যায় জ্ঞানের বীজ ছাত্রগণের মানসক্ষেত্রে রোপন করিতেন এবং যাহাতে সুশিক্ষার সাহায্যে সেই উপ্তবীজ উদ্ভিন্ন হয়, কালে তাহা ফলচ্ছায়া-সমন্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হয় তাহার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিতেন। বর্ত্তমানকালের ছাত্রগণকে অনেকে স্ফটিকগৃহের টবে বর্দ্ধিত কলমের চারার সহিত তুলনা করেন। যথারীতি জল দিলে ইহারা শীঘ্র ফলপ্রসূ হয় বটে কিন্তু জননী ধরিত্রীর সহিত সম্পর্ক না থাকায়, জলসিঞ্চন বন্ধ হইলেই, সেইগুলির প্রমাদ ঘটে। তখন আর ইহারা দীর্ঘকাল ফলদান করিতে পারে না। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ের রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি, বিকৃতমস্তিষ্ক অনেক পনর ষোল বৎসরের বি, এ, এম, এ, দেখিলেই, স্বতঃই ঐ উপমাটী মনে পড়ে। প্রকৃতির সহিত স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার যোগ না থাকাতে, ভূমির সহিত বৃক্ষমূলের সম্পর্ক না থাকার ন্যায় ইহাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে পারে না। মধুসূদনের কালের শিক্ষকগণ অবশ্য বর্ত্তমান সময়ের

ন্যায় নীতি ও নিয়মের কাঁচি হস্তে করিয়া সতত বসিয়া থাকিতেন না। আর সেই জন্য সেকালের ছাত্রগণের মন ও হৃদয়ের বৃত্তিরূপ শাখা পল্লব কোথাও কোথাও এবং কখন কখন উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত।

মধুসূদন কিরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে ও শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বলা হইল। এক্ষণে তিনি কি প্রকার মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন তাহার কথা বলা আবশ্যক। মধুসূদন অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। লেখা পড়ায় সর্ব্বত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবার ইচ্ছা তাঁহার বাল্য কাল হইতেই প্রবল ছিল এবং সেই জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। হিন্দুকলেজে আসিয়া তিনি অল্প দিনের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রায়ই সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতেন। এই সময় হইতেই তিনি বিদ্যালয়ের শ্রেণী-পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্যান্য অনেক পুস্তক পাঠ করেন। মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, তিনি যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন ইংরাজী সাহিত্যের এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, এখন একজন বি, এ, তত গুলি পুস্তক পাঠ করিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। মধুসূদন ভোগবিলাসে অসংযতচিত্ত হইলেও অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিবার তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে তিনি পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইলে তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা, আহার নিদ্রা মনে থাকিত না। যে ভোগবিলাসের উৎকট বাসনার জন্য তাঁহার চরিত্রে নানা কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছিল, বাগ্দেবীর আরাধনা-কালে তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপ দমন করিতে পারিতেন। ইহা দ্বারা তাঁহার বিদ্যালাভের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মধুসূদনের বুদ্ধি সর্ব্ববিষয়গ্রাহিণী ছিল। অনেকের ধারণা যে সাহিত্যসেবকগণ গণিতে স্থূলবুদ্ধি হয়েন।

তাঁহাদের এ ধারণা মধুস্থদনের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ তিনি একবার ক্লাসে তর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে কাব্যামোদী জনও গণিতে পারদর্শী হইতে পারেন, এবং একদিন যখন ক্লাসের সকল বালক গণিতের একটী জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে অপারক হয়েন, তখন তিনি সুন্দর প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার সমাধান করিয়া নিজের কথা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক সাহিত্যানুরাগ হেতু তিনি তাহার পর আর গণিতে মনোনিবেশ করেন নাই।

হিন্দুকলেজে শিক্ষাবস্থা হইতেই তিনি পঠন ও লিখন উভয়বিধ উপায় দ্বারা সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ সভা সমিতি গঠন করিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। গৃহে অভিভাবক ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক উভয়ে এবিষয়ে উৎসাহ দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসন মধুস্থদনের প্রকৃতি-দত্ত সাহিত্যানুরাগ যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তেমনই উৎকৃষ্ট রচনা-পদ্ধতি শিখাইয়া এবং তাঁহার রচিত কবিতা সকল সংশোধিত করিয়া তৎকালীন "লিটারারী গ্লিনার" "ব্লসম্" "কমেট" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করাইয়া উৎসাহিত করিতেন। হিন্দুকলেজে অবস্থান-কালে তাঁহার সাহিত্য-ক্ষেত্রে শিক্ষানবিসীর সূচনা হয়। এই সময় হইতেই সাহিত্যজগতে সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার বাসনা তিনি যত্নের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। সহপাঠীদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় বন্ধুগণের সহিত পত্রালাপে হৃদয়ের এই উচ্চাভিলাষের কথা তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। মধুস্থদন যে জীবনের নানা অবস্থাবিপাকে পড়িয়াও সেই উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করেন নাই, তাহা ক্রমে দেখান যাইতেছে। মধুস্থদনের হিন্দুকলেজে শিক্ষাবস্থায় কলিকাতার ছাত্র-সমাজের নৈতিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। যে সকল অনাচার ও

কদাচারের নাম এখন লোকে ঘৃণার সহিত উল্লেখ করে তখনকার ছাত্রগণ আপনাদিগকে 'নব্যবঙ্গ' নামে অভিহিত করিয়া সেই সকল কুকার্য্য, অহঙ্কার গৌরব ও স্পর্দ্ধার সহিত করিতেন। তৎকালের ছাত্রগণের অধিকাংশই উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী ছিলেন। সমাজ-প্রচলিত কর্ম্মের বিপরীত কর্ম্মই সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার রম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণ মুগ্ধ হইয়া যান। এবং তাঁহারা ইউরোপীয়গণের ন্যায় বলবীর্য্যবান হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদ আহার বিহার এমন কি তাঁহাদের ঘৃণা ও রুচির অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

শুনা যায় তখনকার ছাত্রসমাজে নির্জলা ব্রাণ্ডি পান ও অর্দ্ধপক্ক গোমাংস ভক্ষণ "বাহবার" কার্য্য ছিল। ইউরোপীয় ফ্যাশনের প্রভাবও কম ছিল না। কথিত আছে স্বয়ং মধুসূদন একদিন এক সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া কোন সাহেব পরামাণিকের দোকানে কেশ বিন্যাস করিয়া আসেন। এই প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া কত ধনীর সন্তান লেখাপড়া ত করিতই না, অধিকন্তু ধনে প্রাণে মারা যাইত। মধুসূদনের প্রশংসার মধ্যে এই যে, এইরূপ প্রভাবের মধ্যে থাকিয়া এবং অন্যান্য গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও বাগ্দেবীর সাধনায় কখন বিরত হয়েন নাই। মধুসূদনের জীবনে এই সময় একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটে। হিন্দু কলেজে পাঠের শেষাবস্থায় তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উহা সেকালের 'নব্যবঙ্গের' মতিগতির অত্যধিক উৎকর্ষের ফল মাত্র। মধুসূদনের এসকল কার্য্যের আলোচনা আমরা এখানে করিব না। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মাইকেল মধুসূদনদত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গালীর চক্ষে শ্রীহীন হইলেন।

১৮৪৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মধুসূদন খ্রীষ্টান হয়েন। ইহার পর তিনি কিছুদিন শিবপুরের বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। হিন্দু

কলেজে অবস্থানকালে কাপ্তেন রিচার্ডসন যেমন তাঁহাকে কাব্যজগতের সৌন্দর্য্যাদি দেখাইয়া কবিতা রচনায় সুশিক্ষিত করেন, বিশপস্ কলেজে অবস্থান-কালে তথাকার বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপকগণ তাঁহাকে বিবিধ ভাষা শিখিতে সহায়তা করেন। বিশপস্ কলেজে তিনি চারি বৎসর অবস্থান করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, লাটীন, ফরাসী, জার্ম্মানী এবং ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষিত ইংরাজের ন্যায় অনর্গল বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় তিনি এতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন যে ঐ দুই ভাষাতে অক্লেশে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পরেও তাঁহার সুশিক্ষার জন্য তাঁহার স্নেহশীল পিতা তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতাও পিতার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রায়ই অর্থ-সাহায্য করিতেন। এই প্রচুর অর্থ যে কেবল তাঁহার সুশিক্ষার জন্য ব্যয় হইত তাহা নাহে। বিশপস্ কলেজে অবস্থান কালে, তিনি তথাকার খৃষ্টান যুবকদের কুসংসর্গে পড়িয়া আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়েন। তাঁহার ঔদ্ধত্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাঁহার উদ্ধত ও অশিষ্ট চরিত্রের জন্য পিতার সহিত বিষম মনোমালিন্য ঘটে। ক্রমে তিনি পুত্রকে যে অর্থ-সাহায্য করিতেছিলেন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। এত দিন স্ব-সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও কোন রূপে স্বদেশে ছিলেন। কিন্তু অতঃপর পিতার ত্যাজ্য পুত্র হইয়া অর্থাভাবে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। যে ধর্ম্ম লোককে রক্ষা করে, সেই ধর্ম্ম মধুসূদন ত্যাগ করেন। তিনি খৃষ্টান-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তিনি খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। কারণ ধার্ম্মিক হইলে তিনি কখনই ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হইতেন না। ইহার ফলে এই হইয়াছিল যে, তিনি কোথাও শান্তি পাইতেন

না। স্বদেশে প্রবাসী হইয়া থাকা অপেক্ষা প্রকৃত প্রবাসই তিনি পছন্দ করিলেন। তিনি মান্দ্রাজে গিয়া সুখে ও শান্তিতে থাকিবেন এই আশায় মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। ১৮৪৮ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি মান্দ্রাজে বাস করেন। মান্দ্রাজে গিয়া তিনি অবস্থার উন্নতি করিবেন, শান্তি পাইবেন এবং সুখে থাকিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের এসকল আশা সেখানে পূর্ণ হয় নাই। মান্দ্রাজে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত হিতৈষী বা বন্ধু বড় কেহ ছিলেন না। মান্দ্রাজ যাত্রার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অর্থকষ্ট হইয়াছিল। অধিক কি তাঁহাকে পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করিতে হয়। মান্দ্রাজে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি একরকম রিক্তহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একে এই দারুণ দারিদ্র্য, তাহার উপর রোগ আসিয়া দেখা দিল। মান্দ্রাজে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই তিনি কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েন। মধুসূদনের এই সময়কার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এখন কল্পনায় আনিলেও কষ্ট হয়। না জানি তিনি কি অসহ্য যন্ত্রণাই সহ্য করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্তপরিবারের সন্তান সংসারের সকল সুখ থাকিতেও তিনি নিজ কর্ম্মফলে সেই সুদূর প্রবাসে অনাথ অসহায় অবস্থায় পড়িয়া প্রথমে কি কষ্টই না ভোগ করিলেন! আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সেই দুর্দ্দিনে সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিও সকলকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল একমাত্র বাগ্দেবীর উপাসনা তিনি ত্যাগ করেন নাই। দেবীও ভক্তকে ত্যাগ করেন নাই। মধুসূদন খৃষ্টীয়বিদ্যামন্দিরে প্রথমে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজের বিবিধ সংবাদপত্রাদিতে লিখিতে লাগিলেন। এতদিন যশের জন্য সাহিত্যসেবা করিতেছিলেন এখন জীবিকার জন্য

সাহিত্যসেবা করিতে লাগিলেন। বরদা বাগ্দেবী ভক্তের সাধনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতঃপর যশ ও জীবিকা দুই দিতে লাগিলেন। যখন সাহিত্যসেবা দ্বারা ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল পাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসাও পাইতে লাগিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা যদি আমরা কল্পনার চক্ষে এখন দেখিতে পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই তাহা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দেখিতাম। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে মধুসূদন বাগ্দেবীকে সম্বোধন করিয়া ঃ—

"বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশ দিকে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাহি যার কেহ
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ
নিরাশ্রয়জন, পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।"

বলিতেছেন, এই দৃশ্যই কল্পনাযোগে মানসক্ষেত্রে উদিত হয়।

মধুসূদনের অদম্য ইচ্ছাশক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মান্দ্রাজপ্রবাসকালে দুর্ল্লঙ্ঘ্য দারিদ্র্যগিরি তাঁহার সেই ইচ্ছার সম্মুখবর্ত্তী হয়। মধুসূদন তাহা অতিক্রম করিতে প্রয়াস পান। এবং ইহার ফলে কাব্যজগতে "ক্যাপটীবলেডী" নামক একটী ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। ক্যাপটিব লেডীর বর্ণনীয় বিষয় সংযুক্তাহরণ। মধুসূদনের রচনা ইংরাজীতে হইলেও উহা তাঁহার হৃদয়ের ন্যায় দেশীয় উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। দেশের পুরাণ ইতিহাস হইতেই তিনি তাঁহার প্রথম কাব্যের নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষায় রচনা অনভ্যস্ত হইলেও তিনি দেশের পুরাণ ইতিহাসের সহিত

সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন একথা ক্যাপটীবলেডী পাঠে বেশ বুঝা যায়। ক্যাপটীবলেডীর সমালোচনা এবং সমাদর ভালই হইয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের জন্মভূমি বঙ্গদেশে ক্যাপটীবলেডীর তেমন আদর বা আলোচনা হয় নাই। তিনি কলিকাতার সংবাদপত্রে সমালোচনার জন্য ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহারের জন্য কয়েকখণ্ড পুস্তক পাঠান। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহার পাঠান, তাঁহাদের মধ্যে ভারতহিতৈষী মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব একজন। বেথুন সাহেব পুস্তক পাঠ করিয়া রচয়িতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাকে একটী অমূল্য উপদেশ দেন। বলিতে কি, কাব্যজগতে মধুসূদনের প্রবল ইচ্ছাশক্তির গতি মহাত্মা বেথুনই নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বেথুন সাহেব ক্যাপটীবলেডীতে কল্লোলিনীর শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেই কলনাদিনীকে বঙ্গভাষাভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইতে পারিলে বঙ্গভাষার সমূহ উপকার হইবে এই বিশ্বাসে তিনি মধুসূদনকে সেই সুন্দর উপদেশ দেন। মহাত্মা বেথুনের মহামূল্য উপদেশ ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের শুনা উচিত। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, অবকাশরঞ্জনের জন্য অথবা ইংরাজী ভাষাতে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য মাঝে মাঝে ইংরাজী রচনা মন্দ নহে। কিন্তু যাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে, তিনি মাতৃভাষায় রচনা করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার করিবেন এবং নিজেও যথেষ্ট যশ লাভ করিবেন। এমন কি মৌলিক রচনা না করিতে পারিলেও কেবল ভাল ভাল বিষয় বিশুদ্ধরূপে অনুবাদ করিয়া দেশের ও মাতৃভাষার প্রভূত উপকার করা যাইতে পারে।*

---

* ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা বেথুন বঙ্গদেশীয় যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজের পারিতোষিক বিতরণ সভায় দেশীয় ভাষা চর্চ্চা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ উপদেশ দেন তাহার অনুরূপ উপদেশ সম্প্রতি বোম্বাইয়ের সুযোগ্য গভর্ণর মহামতি

মধুসূদন শুভক্ষণে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মধুসূদন বঙ্গসাহিত্য-সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ আনাইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মধুসূদন বিবিধ ভাষার বহুবিধ কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন। মধুসূদন আজন্মকবি। কবিজনোচিত প্রবণতা চিরকালই তাঁহার হৃদয়ে ছিল। তাহার উপর বহু ভাষার সাহিত্য আলোচনা করিয়া তিনি ভাবসম্পদে সৌভাগ্যবান ছিলেন। বঙ্গভাষার

লর্ড নর্থকোট সাহেব দেশীয় রাজকুমারগণকে দিয়াছেন। লর্ড নর্থকোটের বক্তৃতার অংশ এইঃ—"I would impress upon you the great necessity of a thorough study of your own vernaculars. You have every reason for such a study. I myself—though I can only read the works in an English partial translation—read with utmost pleasure such works as the Mahabharata and Ramayana, and you, here in this country of the East, in a land teeming with legend and tradition must possess treasures of vernacular stores of learning of which most of us, Europeans, have not even heard the title. In the second place, it is an almost necessary attribute of a gentleman that he should have a thorough knowledge of his own tongue and of the principal works composed therein. What would be thought in England of an average English gentleman who did not know his Shakespeare and other ordinary English classics? You, who will occupy relatively far more prominent position in your own country than the ordinary English gentleman holds, should know its language and literature thoroughly. Lastly, I would remind you, if you wish to learn English or any other language really well, a thorough knowledge of your own tongue is, to say the least, an immense advantage. You may pick up otherwise the same sort of colloquial knowledge of English that any of us do, of Guzarati or Marathi, but you cannot learn a foreign tongue thoroughly and scientifically until you are absolute master of your own" : মহামতি লর্ড নর্থকোটের উপদেশে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের ভাবিবার ও শিখিবার অনেক কথা আছে।

শব্দসম্পদ সংগ্রহের জন্য তিনি মহাভারত রামায়ণের আশ্রয় লইলেন। এবং সংস্কৃতও চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজপ্রবাসকালে তিনি কিরূপ অধ্যয়নপর ছিলেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অধ্যয়নশীল ছাত্রকেও তিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন। উদরান্ন সংগ্রহের জন্য তিনি চারি ঘণ্টা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। বাকী অধিকাংশ সময়ই ভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত করিতেন। প্রাতে দুই ঘণ্টা হিব্রু, মধ্যাহ্নে দুই ঘণ্টা গ্রীক, অপরাহ্ণে তিন ঘণ্টা তেলেগু ও সংস্কৃত, সায়াহ্নে দুই ঘণ্টা লাটীন এবং রাত্রিতে তিন ঘণ্টা ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। এইরূপ সাধনার মধ্যে তাঁহার মান্দ্রাজে প্রবাসকাল শেষ হয়।

১৮৫৬ সালের প্রথমে মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। স্বদেশে ফিরিলেন বটে, কিন্তু সেখানে স্বজন এমন কেহ ছিলেন না যে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া গ্রহণ করেন। মান্দ্রাজে অবস্থান-কালে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার খিদিরপুরের বাটী তখন অন্যের অধিকৃত। তিনি "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইলেন। যাহা হউক তিনি কলিকাতায় পুনরায় বাসস্থান করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি কলিকাতার পুলিস আদালতে কেরাণীর কর্ম্ম পাইলেন। ঐ কর্ম্ম তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই। শীঘ্রই তিনি দ্বিভাষীর পদে উন্নীত হন। মধুসূদন এখন কলিকাতায় অনেকটা নিশ্চিন্ত ও স্থায়ী ভাবে থাকিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা হইল। এ দিকে তাঁহার চিরজীবনের সখা গৌরদাস বাবুর সাহায্যে তিনি কলিকাতার সৌখীন ও শিক্ষিত সমাজে মিশিবার সুযোগ পাইলেন। সেখানে গৌরদাস বাবুর দ্বারা পরিচয় মাত্রের আবশ্যক ছিল। মধুসূদন অসংযত চরিত্র হইলেও তাঁহার অন্যান্য অনেক গুণ ছিল। তিনি বিদ্বান, মিষ্টভাষী, সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন। ক্ষণিকের আলাপে

লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে সকলের নিকট তিনি পরিচিত হইলেন এবং শিক্ষিত ও সৌখীন সমাজে মধুসূদনের বিদ্যাবত্তা প্রভৃতির কথা প্রচারিত হইল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ বেলগাছিয়ার থিয়েটারের উদ্যোগ হয়। বাঙ্গালী নাটক অভিনয় করিবেন, নাট্যশালা নির্ম্মিত হইল। কিন্তু বাঙ্গালায় নাটক কই? কাজেই পুরাতন রত্নাবলীর বাঙ্গালা অনুবাদ হইল। বেলগাছিয়ার থিয়েটারের উদ্যোগ ও আয়োজন অতি সুন্দররূপে করা হয়; এবং সেখানে অভিনয় দেখিবার জন্য অনেক য়ুরোপীয় ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহাদের জন্য রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদের আবশ্যক হয়। এই অনুবাদকার্য্য মধুসূদন করেন। রত্নাবলীর অনুবাদ পাঠ করিয়া কি দেশীয় আর কি য়ুরোপীয় ভদ্রলোক, সকলেই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়-যোগ্য নাটক তখন প্রায় ছিল না বলিলেও হয়। এই অভাব মধুসূদন বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিলেন। এই অভাব মোচনের জন্য তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টার প্রথম ফল শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। শর্ম্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ তখনকার নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। মধুসূদন যখন এই নাটক রচনা করেন তখন তিনি পুরা সাহেব। ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, আহার বিহারে, তিনি সম্পূর্ণরূপে বিজাতীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে যে একটা জাতীয়তা ছিল একথা তাঁহার বয়স্যেরা কেহ জানিতে পারেন নাই। তাহার উপর, প্রথম চেষ্টায় তিনি যে অমন সুন্দর বাঙ্গালা রচনা করিতে পারিবেন, একথাও কেহ প্রথমে ভাবেন নাই। সুতরাং শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া যে সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন তাহা আর বিচিত্র কি? নব্য সম্প্রদায় ত তাঁহার

পাণ্ডুলিপি পাঠে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের চক্ষে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের বহু দোষ ছিল। এবং উহা নাটকই হয় নাই বলিয়া তাঁহারা ঘৃণা প্রকাশ করেন। মধুসূদন পণ্ডিত-সমাজের মত গ্রাহ্যও করিলেন না। তিনি নিজের ক্ষমতায় আস্থাবান ছিলেন। নিজের বিচারশক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রতিকূল সমালোচনাকে উপেক্ষা করিয়া সাহসের সহিত শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনয়ের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিলেন। মধুসূদনের সাধনায় ও সাহসে দেবী সরস্বতী সুপ্রসন্ন হইলেন এবং উপদেশ স্থলে বঙ্গ কুললক্ষ্মী নিশার স্বপনে যেন সত্য সত্যই বলিলেন।

—হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?

অতঃপর দেবী সরস্বতীর বরে মধুসূদন বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সিদ্ধপুরুষ।

জগতে সকলে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসে নাই। কর্ম্ম আমাদের সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য হইলেও তাহার প্রকার-ভেদ আছে। সমাজের বিভাগ-ভেদে কর্ম্মভেদের ব্যবস্থা আছে। লোকে আপন আপন ক্ষমতা ও রুচির প্রবণতা অনুসারে কার্য্য করিবে। আমরা রামদুলাল সরকারের জীবনে এই বিষয়ের একটী উজ্জ্বল আদর্শ দেখিতে পাই। রামদুলাল প্রকৃত পক্ষেই ভিক্ষালব্ধ অন্নে শৈশবে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। অর্থের অভাব কত তীব্র, অন্নের চিন্তা কত ভয়ঙ্কর, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার প্রতিপালক মদনমোহন দত্তের সৌভাগ্য ও সৌজন্যও তিনি দেখিয়াছিলেন। ক্রমে মদনমোহনের অনুগ্রহে তিনি বিল ও সিপ সরকারের কার্য্যে প্রবিষ্ট

হইয়া কলিকাতার তদানীন্তন বাণিজ্যের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই কথার সারবত্তা তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। লেখা পড়ায় পণ্ডিত হইতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। —বাণিজ্য করিব, প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিব—ক্রিয়াকলাপে জীবনকে ধন্য করিব—এই আশাই তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি বাণিজ্যের গূঢ় রহস্য শিখিয়াছিলেন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ সেইখানেই শিখিয়াছিলেন এবং তাহাই জীবনের মূল মন্ত্র করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে সেই মন্ত্রের সাধনা করিয়া সেই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া তিনি সেই মহাবাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

মূলধন অল্প হইলেও তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু তাহা যদি বিবেচনা করিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করা যায় তবে তাহাতেও যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়, ইহা রামদুলালের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনশন বা অর্দ্ধাশন জনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়া পাঁচ টাকা বেতন হইতে অল্পে অল্পে এক শত টাকা সঞ্চয় করেন। এবং উহা দ্বারা কাঠের ব্যবসায় করেন। ঘটনাটী সামান্য। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহাই রামদুলাল সরকারের জীবনের মূলমন্ত্র "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" সাধনার প্রথম অনুষ্ঠান।

রামদুলাল সরকার বাল্যকাল হইতে অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন। বিল সরকারী এবং সিপ সরকারী কার্য্য গ্রহণ আর তাহা দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত সম্পাদন করাই তাঁহার শ্রমশীলতার যথেষ্ট প্রমাণ। সুরম্য হর্ম্মের কক্ষাভ্যন্তরে লম্বমান বায়ু-সঞ্চালনী-সমন্বিত, বীরণমূলের মৃদুগন্ধামোদিত কার্য্যালয়ে সামান্য বেতনের মসীজীবিগণ প্রায়ই আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অতিরিক্ত শ্রমসাপেক্ষ ও কষ্টদায়ক বলিয়া ভাগ্যকে

নিন্দা করিয়া প্রভুর কার্য্যে প্রবঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, এবং এক গোলামী ত্যাগ করিয়া অপরত্র গোলামীর চেষ্টা করেন। দশ পাঁচ টাকা বেতনের বিল সরকারী বা সিপ সরকারী কার্য্য বিশ্বাস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত করিতে হইলে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম ও লোভ-সংবরণ আবশ্যক ইঁহারা তাহা সহজে ধারণা করিতে পারেন না। যদি তাঁহারা তাহার ধারণা করিতে পারিতেন, তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইত এবং দুর্দ্দশা-মোচনের সম্ভাবনা থাকিত। একবার একজন লোক কোনও অবসর-প্রাপ্ত,যশস্বী, সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত সৈনিক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়, কি করিলে আপনার ন্যায় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারা যায়? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, ইহা অতি সামান্য কথা। যাহা করিলে আমার এই ঐশ্বর্য্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা এখনই বলিতেছি। আপনি বসুন। আপনাকে একটী সর্ত্ত করিতে হইবে। সেই সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিলেই আপনি আমার এই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইবেন। লোকটী বিস্মিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। সৈনিক পুরুষ বলিতে লাগিলেন সর্ত্তটী এই :— আপনি ও আমি দশ বার হাত ব্যবধানের মধ্যে থাকিব। এবং আমি আপনাকে পনর বার তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত করিতে চেষ্টা করিব; ততোধিক বার বন্দুক দ্বারা আহত করিতে চেষ্টা করিব। আমার এই সকল আক্রমণ হইতে যদি আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তবে আমার এই সমস্ত বিষয় বিভব আপনার। লোকটী এই ভীষণ সর্ত্তের কথা শুনিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং কম্পিত অধরে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, না মহাশয়, ঐশ্বর্য্যের আবশ্যকতা নাই। তখন ঐ সৈনিক পুরুষ আবার বলিতে লাগিলেন, দেখুন, আমি অনেক রণক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আদেশের অধীন হইয়া উহা অপেক্ষা অধিকতর বিপদ-সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে কার্য্য করিয়াছি। হস্তে, বক্ষে, কত ক্ষত-চিহ্ন দেখুন, কত বার

যে মৃত্যু মুখ হইতে ফিরিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। জীবন-মরণের মধ্যে সাধনা করিয়াছিলাম। সে সাধনায় এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।

যদি সাদৃশ্য থাকিলে ক্ষুদ্র বৃহতের মধ্যে তুলনা সঙ্গত হয়, তবে বীর সৈনিক পুরুষের ভাগ্য-লাভের কাহিনী বাঙ্গালী রামদুলালের ভাগ্য-লাভের কাহিনীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সৈনিক পুরুষের ন্যায় তিনিও ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপাকাঙ্ক্ষী যুবককে বলিতে পারিতেন, বাপু হে, যদি বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে, নিত্য আট দশ ক্রোশ পথ পদব্রজে গতায়াত করিতে পার, যদি শ্রাবণের মুষলধারার মধ্যে দস্যু-ভয়-পূর্ণ মাঠে শৃগাল কুক্কুরের ভয়াবহ চীৎকার মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকারময়ী রাত্রিতে বৃক্ষতলে প্রভুর প্রচুর অর্থ একাকী রক্ষা করিতে সমর্থ হও, যদি গঙ্গার গভীর জলে পতিত হইয়াও প্রভুর স্বার্থ ও নিজের জীবন রক্ষা করিতে পার, যদি বিপুল অর্থ পাইয়া, কলঙ্কের ভয় না থাকিলেও, তাহার স্বত্ব অম্লান বদনে ত্যাগ করিতে পার, তবে আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার জন্য তোমাকে যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচনা করিব। জিজ্ঞাসা করি, কয়জন যুবা এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন? অনেকেই এই প্রস্তাব শুনিয়া ইতস্ততঃ করিবে এবং কেশ কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিবে, প্রাণটা আগে, অর্থ পরে, প্রাণ থাকিলে ভিক্ষা করিয়া খাইব। যাহারা এই রূপ কাপুরুষ, শ্রমবিমুখ, তাহারা কবে কোথায় কি করিয়াছে? যাহারা বাল্যে কৈশোরে শিক্ষায় অমনোযোগী, যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্যে উপেক্ষাশীল, তাহাদের বার্দ্ধক্য যে বিড়ম্বনা-পূর্ণ হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

রামদুলাল সরকারের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইতে হইলে রামদুলাল সরকারের ন্যায় সাধনা করিতে হইবে। তিনি বাল্যে পরান্নে প্রতিপালিত হইয়া অতিকষ্টে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদূর বিদ্যাভ্যাস করিয়া

হস্তাক্ষর মুক্তামালার ন্যায় সুন্দর করিয়াছিলেন। যখন যে অবস্থায় থাকিবে, সেই অবস্থাতেই প্রাণ পণ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে কার্য্য করিবে এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া যেন তিনি কার্য্য করিতেন। পাঁচ টাকার বিলসরকারের কার্য্যও তিনি সাধুতা ও নিষ্ঠার সহিত করিতেন। দমদমা ও বারাকপুরের সৈন্যাবাসের সাহেবদের সহিত তাঁহার প্রভুর কারবার ছিল। ইঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য কলিকাতা হইতে পদব্রজে প্রায়ই সে সকল স্থানে নিত্য যাতায়াত করিতে হইত। কি বৈশাখের রৌদ্র, কি শ্রাবণের ধারা, আর কি পৌষের শীত, কিছুই তাঁহার কর্ত্তব্য-সাধনের অন্তরায় হইত না। তখন কলিকাতা হইতে বারাকপুরের পথ বড় বিপদসঙ্কুল ছিল। শুনা যায় একবার রামদুলাল বিলের টাকা লইয়া আসিতেছেন এমন সময়ে দমদমার নিকট পথে রাত্রি হয়। তিনি পাছে প্রভুর টাকা দস্যু-তস্করের দ্বারা অপহৃত হয়, এই ভয়ে, পথের ধারে কোনও লোকের বাটীতে আশ্রয় না লইয়া গাছতলায় দরিদ্র পথিকের বেশে টাকাগুলি লইয়া রাত্রি যাপন করেন। ইহা কি কম কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয়? ইহার পর রামদুলাল যখন দশ টাকা বেতনের সিপসরকার তখন জাহাজে প্রভুর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গিয়া দুই বার জলমগ্ন হয়েন। তিনি দুই বারই সন্তরণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এই সকল ঘটনা হইতে দেখা যায় যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা চিরকালই তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ যিনি, তিনি যে সত্যপরায়ণ ও নির্লোভ হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। রামদুলালের সত্যনিষ্ঠা ও লোভসম্বরণই সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার সৌভাগ্য আনয়ন করে। যে ঘটনায় তাঁহার ভাগ্যদেবতা তাঁহার উপর প্রসন্ন হয়েন, সেটী এই ঃ—রামদুলাল বিদ্বান ছিলেন না। পুস্তকাদি পাঠে অন্যের অভিজ্ঞতা জ্ঞাত হইতে পারেন নাই তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার

ঐশ্বর্য্যের ন্যায় স্বোপার্জ্জিত। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর শিক্ষাগারে, লোকচরিত্র ও ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যখন সিপ-সরকারের কাজ করেন, তখন অর্ণব-বাণিজ্য-বিষয়ের অনেক তথ্য শিখিয়াছিলেন। জাহাজে করিয়া কিরূপ মাল আমদানি রপ্তানি হয়, কিরূপ জাহাজে কি প্রকার দ্রব্য থাকিতে পারে, কোন কোম্পানীর জাহাজে কি কি দ্রব্যাদির ব্যবসায় হয়, ইত্যাকার বহুবিধ সংবাদ তিনি জানিতেন। এই প্রকার জাহাজের বিশেষ জ্ঞান থাকাতে তিনি জলমগ্ন জাহাজের আনুমানিক মূল্যাদি নিরূপণে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। রামদুলালের এই বিষয়ের পারদর্শিতাই ভবিষ্যতে তাঁহার বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি সে সময়ে টালায় এইরূপ জলমগ্ন জাহাজ সকল নীলাম হইত। টালা নীলামের জন্য প্রসিদ্ধ। একবার মদনমোহন দত্ত রামদুলালের হাতে ১৪০০৲ টাকা দিয়া টালায় কোন নীলাম খরিদের জন্য পাঠান। কিন্তু রাম-দুলাল বিজ্ঞাপিত সময়ে সেখানে পঁহুছিবার আগেই সেটীর নীলাম শেষ হইয়া যায়। রামদুলাল অবশ্য ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক তিনি সেই দিন সেই খানে উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই আর একখানি জলমগ্ন জাহাজ নীলামে উঠে। জাহাজ খানির কথা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। নীলাম স্থলে জাহাজের মূল্য হিসাবে ডাক অত্যন্ত কম হইতেছে তাহা তিনি বুঝিলেন। এবং শেষে নিজের দায়িত্বে, প্রভুর বিনা অনুমতিতে, তিনি ১৪০০৲ টাকায় ঐ জাহাজ নীলাম ডাকিয়া লইলেন। রামদুলালের ডাক গ্রহণের অল্পক্ষণ পরে একজন বিশিষ্ট এবং সম্পন্ন সাহেব বণিক সেখানে উপস্থিত হইলেন। বণিক দেখিলেন তিনি বিলম্বে আসিয়াছেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই জাহাজ নীলাম হইয়া গিয়াছে। এবং একজন বাঙ্গালী সরকার ঐ জাহাজ নীলাম ডাকিয়া লইয়াছে। সাহেব খুঁজিয়া রামদুলালকে

বাহির করিলেন। তাঁহাকে নানাভাবে নানা কথা বলিলেন। শেষে রামদুলাল একলক্ষ টাকা লাভে জাহাজ সাহেবকে বিক্রয় করিয়া দিলেন। এত যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, রামদুলালের প্রভু মদনমোহন দত্ত তাহার কিছুই জানিতেন না। সাহেব যখন সমস্ত মূল্য দিলেন তখন রামদুলাল ঐ টাকা লইয়া প্রভুর হস্তে দিয়া আমূল বৃত্তান্ত বলিলেন। মদনমোহন উপযুক্ত ভৃত্যের উপযুক্ত প্রভু ছিলেন। তিনি লভ্যাংশ গ্রহণ করিলেন না। তিনি ঐ টাকা রামদুলালকে দিলেন। রামদুলাল ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ঐ টাকা প্রভুর অজ্ঞাতসারে লইয়া প্রভুর টাকা প্রভুকে দিতে পারিতেন। কিন্তু রামদুলালের প্রবৃত্তি অন্যরূপ ছিল। এইরূপ অবস্থায় লোভ সম্বরণ করিতে যে কতটা মনের বল আবশ্যক তাহা বুঝা চাই। এই অসাধারণ চরিত্র-বলের জন্য মদনমোহন দত্ত তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। প্রভুর প্রদত্ত ঐ পুরস্কারের টাকা তাঁহার সৌভাগ্য-সৌধের প্রথম সোপান হইল। যে বালক অনশন ও অর্দ্ধাশনের ক্লেশ সহ্য করিয়া শত মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মন্ত্র সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, আজ যৌবনে ভগবৎ-প্রসাদে তিনি লক্ষ মুদ্রায় বিস্তৃতরূপে বাণিজ্যের প্রসার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। ইহার পর তাঁহার বাণিজ্য বহুদেশে বিস্তৃত হয়। বন্দরে বন্দরে তাঁহার জাহাজ যাইত। এই সুসময়েও তিনি একদিনের জন্য শ্রমবিমুখ ছিলেন না। দেবদ্বিজে তাঁহার ভক্তি কমে নাই। সত্য ও কর্ত্তব্যের পথ তিনি ত্যাগ করেন নাই। এবম্প্রকার অসাধারণভাবে সাধনা করিয়া রামদুলাল ভাগ্যদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। সাধনা বিনা সিদ্ধি কোথায়?

আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, অল্প বিস্তর মূলধন লইয়া পণ্য সংগ্রহ করিয়া দোকান সাজাইয়া বসিলেই ব্যবসা করা হয়। আর

ব্যবসা বাণিজ্য করিলেই লাভ হয়। এই রূপ বিশ্বাস লইয়া এবং কেবল পাটীগণিতের সাহায্যে লাভের অঙ্ক গণনা করিয়া বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক ভদ্র সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এবং তাঁহারাই শেষে বলেন যে, ব্যবসা করা "ভদ্রলোকের" কাজ নহে। "মুদী বেণেরই" ওসকল পোষায় বলিয়া তাঁহারাই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সকল ক্ষতিগ্রস্ত লোকের আমূল কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের ঐ ঘৃণাসূচক মন্তব্যের কোনও মূল্য নাই। কারণ "ভদ্রলোক" হওয়ার জন্য তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন না। অধিকন্তু ব্যবসায়িক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবেই তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান যেমন শিক্ষা-সাপেক্ষ, বাণিজ্য ব্যবসায় যে তদ্রূপ শিক্ষাসাপেক্ষ এ কথাটা বিচারস্থলে অনেকেই ভুলিয়া যান। ইহার প্রধান কারণ যে আমাদের দেশে সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞান শিখিবার যেমন বিদ্যালয় আছে বাণিজ্য শিখিবার তেমন ব্যবস্থা নাই। * বাণিজ্য যে আবার শিখিতে হয় এটা অনেকের ধারণার মধ্যেই আসে না। বাণিজ্য শিখিবার কোন শিক্ষাগার নাই বলিয়া যে লোকে বাণিজ্য শিখে না তাহা নহে। বেতন দিয়া ছাত্র হইয়া বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের প্রথা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার। বিপণি বাণিজ্য শিক্ষার শিক্ষাগার। পণ্যবীথিকাই পণ্য পরিচয়ের উৎকৃষ্ট স্থান। ধনী বণিক সন্তানগণ সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াই আপন আপন পৈতৃক দোকানে বসিয়া বাণিজ্য শিক্ষা করিয়া থাকেন। দরিদ্রসন্তানের মধ্যে অনেকে উদরান্নের জন্য এই সকল দোকানে সামান্য বেতনে চাকরী গ্রহণ

* সম্প্রতি কয় বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডেন্সি কলেজের অধীনে একটী বাণিজ্য শিক্ষাশ্রেণী commercial class প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আশা করা যায়, কালে ইহার দ্বারা বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষ উপকার হইবে।

করিয়া উদরান্নসংগ্রহ ও বাণিজ্য শিক্ষা উভয়ই করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যালয়ের ন্যায় বাণিজ্য-শিক্ষাগার সর্ব্বত্র নাই বলিয়া যে বাণিজ্যশিক্ষার আবশ্যক নাই এরূপ বিবেচনা করা ভুল। ইয়ুরোপের শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যালয় থাকিলেও শিক্ষানবীশ সংক্রান্ত আইন আছে। ঐ আইন অনুসারে, অনেক দোকানদার বালকগণকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ঐ সকল শিক্ষানবীশেরা আবশ্যক মত দোকানের সর্ব্ব প্রকার কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে। একাজ করিব না ও কাজ করিব বলিয়া তাহারা অভিমান করিয়া সেখানে বসিয়া থাকিতে পায় না। কর্ম্মদক্ষ হইলে কিছু কাল অল্প বেতনে সেখানে চাকরি করিয়া তাহারা নিষ্কৃতি পায়। দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে এরূপ আইন হিতকর।

আমাদের দেশে শিক্ষানবীশ সংক্রান্ত আইন উকীলের পুস্তকালয়ে দেখা যায়। কিন্তু উহা কার্য্যতঃ তেমন চলিত নাই। যাহা হউক, ঐ আইন চলিত না থাকিলেও শিক্ষানবীশী প্রথা চলিত আছে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেরা বৃথা অভিমানের জন্য আপন আপন সন্তানকে দোকানে শিক্ষানবীশী করিতে দেন না। যে সকল যুবকের ব্যবসায়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং উহাতে প্রবণতা আছে তাহাদের বাণিজ্যব্যাপারে শিক্ষানবীশী করিতে দেওয়া উচিত। তাহাতে সুফলই হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ পার্শী বণিক স্যর জেমসেটজী জি জি ভাইয়ের জীবন ইহার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জেমসেটজী জি জি ভাই শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়েন। তাঁহার পিতামাতার জীবদ্দশাতে ফ্রেমজী নসরানজী নামক জনৈক বণিকের দুহিতার সহিত জেমসেটজীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের অভাবে তিনি শ্বশুরের আশ্রয়ে প্রতিপালত হইতে লাগি-

লেন। শ্বশুরের আশ্রয়ে তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার তেমন সুযোগ ঘটে নাই। তিনি গুজরাটী ভাষা লিখিতে পড়িতে পারিতেন এবং অল্প স্বল্প ইংরাজী বুঝিতে পারিতেন। লেখা পড়া শিখিতে যে সময় ও সাধনার আবশ্যক হইত, সেই সময় ও সাধনার সাহায্যে জেমসেটজী শ্বশুরের দোকানে শিক্ষানবীশ হইয়া বাণিজ্য-ব্যাপার শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য ও রহস্য শ্বশুরের আশ্রয়েই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু জেমসেটজী শ্বশুরের আশ্রয়ে বেশী দিন রহিলেন না। ১৭৯৯ খৃঃ অঃ ১৬ বৎসর বয়সে জেমসেটজী একজন পার্শী বণিকের অধীনে কেরাণীর কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চীন দেশে গমন করেন। জেমসেটজী যাইবার সময় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ১২০ টাকা সঙ্গে লইয়া যান। শ্বশুরের সাহায্যে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত এবং তাঁহার প্রদত্ত সামান্য বৃত্তি হইতে ঐ টাকা তিনি সঞ্চয় করেন। ইহা দ্বারা তাঁহার জীবনের সেই সময়ের আর্থিক অবস্থা বেশ বুঝা যায়। ইহাঁর জীবনী আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি কখনও শিক্ষার সুযোগ অবহেলা করিতেন না। চীন দেশে অবস্থান কালে তিনি প্রভুর কর্ম্ম পরিশ্রম ও যত্নের সহিত করিয়া যে অবসর পাইতেন তাহাতে সেখানকার বাণিজ্যের অবস্থা মনোযোগের সহিত দেখিতেন। ভারতবর্ষজাত কোন্ পণ্যের প্রয়োজন চীনে অধিক এবং তাহা কিরূপ লাভে সেখানে বিক্রয় হইতে পারে তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। বাজারে পণ্য দ্রব্য সকলের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি কি অবস্থায়, কি অনুপাতে হয় তাহা বিশেষ মনোযোগ দিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎ-প্রদেশের লোক-চরিত্রও সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে লাগিলেন। কৃতী বণিক হইতে হইলে পণ্যের দোষগুণ যেমন জানা আবশ্যক, বাজারের অবস্থা, ক্রেতাগণের চরিত্র জানাও তদ্রূপ আবশ্যক। জেমসেটজী বোম্বাইয়ের শ্বশুরের দোকানে এসকল বিষয়ে যে সামান্য অভিজ্ঞতা

লাভ করিয়াছিলেন তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। চীনে বাণিজ্যের সুবিধা দেখিয়া তিনি সেখানে বাণিজ্য করিবার জন্য উৎসুক হইলেন; মনে মনে সঙ্কল্প দৃঢ় করিতে লাগিলেন। এবং ইহার জন্য তিনি সাধনা করিতে লাগিলেন। অত অল্প বয়সে তিনি অভিভাবকহীন হইয়া বিদেশে ছিলেন, নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন, বিদেশে সমাজ বা বন্ধুগণের চক্ষের অন্তরালে কত কি করিতে পারিতেন, বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন, চরিত্রে জলাঞ্জলি দিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করিতে পারিতেন। বিদেশে হাতে পয়সা হইলে অনেক যুবকই ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু জেমসেটজী এক দিনের জন্য কুপথগামী হয়েন নাই। তিনি জানিতেন চরিত্র ও স্বাস্থ্যই দরিদ্রের প্রধান সম্বল। এবং তিনি এদুটীকেই যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভুর কার্য্য শ্রম ও যত্নের সহিত করার জন্য এবং তাঁহার চরিত্র ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অভিজ্ঞতার জন্য তিনি অল্প দিনের মধ্যে প্রভুর প্রিয় ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহাদের সমস্ত পণ্য বিক্রয় হইয়া গেল। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিলেন। জেমসেটজীর প্রভুর নিকট তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকে জেমসেটজীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা ও সচ্চরিত্রতার কথা শুনিলেন। এদিকে স্বদেশে আসিয়াই জেমসেটজী চীনে নিজে বাণিজ্য করিবার আশায় মূলধন সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য দু দশ টাকা, বা দু চারি হাজার টাকাতে হয় না। পণ্য ক্রয় করিয়া জাহাজ ভাড়া করিয়া বিদেশে যাইতে হইলে বহু অর্থের আবশ্যক। কিন্তু তিনি নিতান্ত গরিব। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রথম বার চীন যাত্রার সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থার কথা অনেকেই জানিতেন। চীন দেশে কেরাণীর কর্ম্ম করিতে গিয়া, বাণিজ্য-ব্যাপারে যথেষ্ট-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বেতন হইতে সঞ্চিত

কিয়দংশ ভিন্ন অন্য ধন রত্ন যে তিনি আনিতে পারেন নাই তাহাও তাঁহার পরিচিত আত্মীয় বন্ধুগণ জানিতেন।

এমন অবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্যরূপ বৃহদ্ব্যাপারের জন্য চেষ্টা করাও অনেকে তাহার পক্ষে উন্মাদগ্রস্ত বা ধৃষ্টের কার্য্য বিবেচনা করিতে পারেন। কন্থায় শয়ন করিয়া লক্ষ মুদ্রার স্বপ্ন বলিয়া অনেকে উহা উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু জেমসেটজী ঐ সকল ভাবিলেন না। তিনি একাগ্রচিত্তে মূলধন সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভগবানের কৃপায় ও তাঁহার গুণে জেমসেটজীর চেষ্টা সফল হইল। তিনি ৩৫০০০ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ পাইলেন। জেমসেটজীর চেষ্টা ত প্রশংসাযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উত্তমর্ণ এরূপ নিঃস্ব অথচ সদিচ্ছাপন্ন কুশলী ও কর্ম্মঠ যুবকের চরিত্রের আদর ও মর্য্যাদা করিয়া এত অর্থ ঋণ দেন তিনিও কম প্রশংসার পাত্র নহেন। যে দেশে ও যে সম্প্রদায়ে এরূপ গুণগ্রাহী লোক থাকেন সে দেশ ও সম্প্রদায় ধন্য! যে উত্তমর্ণ জেমসেটজীর চরিত্র, অভিজ্ঞতা, শ্রমশীলতার ভরসায় অত টাকা ঋণ দিতে সাহসী হইয়াছিলেন তিনি কুসীদগ্রাহী মহাজন হইলেও তিনি মহাজন ছিলেন। জেমসেটজী যথা সময়ে এই ঋণ সুদসহ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়াছিলেন।

জেমসেটজী সর্ব্বসমেত পাঁচ বার চীন যাত্রা করেন। চতুর্থ যাত্রায় স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হয়েন। সেই সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। জেমসেটজী যে জাহাজে ফিরিতেছিলেন সেখানি যখন সিংহলের সন্নিকট হয় তখন তাহা ফরাসীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। জেমসেটজীর বহু অর্থ ও পণ্য তাহাতে ছিল। জেমসেটজী ও অন্যান্য আরোহিগণ ফরাসীদের নৌসেনাধ্যক্ষকে বিশেষ কাতর ভাবে তীরে অবতরণ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সে কাতর

প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। জেমসেটজী সেই জাহাজে বন্দী হইয়া ফরাসীদের সহিত উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যান। পথে সকল কষ্টই সহ্য করিতে হইয়াছিল। বন্দীর আবার সুখ কোথায়? যাহা হউক সেখানে গিয়াও একেবারে নিরাপদ ছিলেন না ফরাসী কাপ্তেনের সন্দেহ হয় যে, ইংরাজ, পার্সী ও মুসলমান যাত্রিগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সন্দেহের উপর তিনি উহা-দিগকে গ্রেপ্তার করেন এবং অশেষ লাঞ্ছনা করেন ও কষ্ট দেন। এই সময়ে তাঁহাদের কষ্টের সীমা ছিল না।

সমস্ত দিন রাত্রিতে জেমসেটজী একপোয়া চাউল এবং একখানি বিস্কুট আহারের জন্য পাইতেন। যাহা হউক তিনি অনেক কষ্টে কেবল পরিধেয় বস্ত্র মাত্র লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। শারীরিক মানসিক কষ্ট ছাড়াও সেবার জেমসেটজীর ঐ যাত্রায় যথেষ্ট অর্থনাশ হয়। কিন্তু এজন্য তিনি ভগ্নোৎসাহ হয়েন নাই। তাঁহার জীবনচরিতে পাঠ করা যায় যে ইহার পরও তিনি একবার চীনযাত্রা করেন এবং শেষে ১৮০৭ খৃঃ অঃ তিনি বোম্বাই নগরে আসিয়া স্থায়িভাবে কারবার করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে জেমসেটজীর খ্যাতি প্রতিপত্তি চারিদিকে প্রচারিত হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে একাকী সমস্ত কারবার চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া, তাঁহার কারবার বড় বড় ইংরেজ কোম্পানির সমতুল্য করিবার মানসে যৌথ কারবার করিতে লাগিলেন। অন্য কয় জন অংশীদার হইল সত্য, কিন্তু তিনি নিজে কারবারের সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন। এজন্য তিনি কখন আলস্য করিতেন না "আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে" একটী প্রবাদ বাক্য আছে। একথার যাথার্থ্য জেমসেটজী বিলক্ষণ বুঝিতেন। বোম্বায়ে স্থায়ী হইয়া বসিবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন

করিলেন। ১৮২২ খৃঃ অঃ মধ্যে তিনি দুই কোটী টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। জেমসেটজী এখন লক্ষ্মীর বরপুত্র। তাঁহার বাণিজ্যে ত লক্ষ্মী বাস করিতেছিলেন এক্ষণে তাঁহার বাটীতেও চঞ্চলা কমলা অচলা হইলেন। শ্রীমন্ত সওদাগরের কথা এখনও কতলোক আগ্রহ ও ভক্তিসহকারে শুনিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস যে লক্ষ্মীর ভক্ত শ্রীমন্তের সাধনার কথা শুনিলে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ হয়। যদি তাহা হয়, তবে আশা করা যায় যে, জেমসেটজী কমলার প্রীতি লাভের জন্য জীবনে যে মহীয়সী সাধনা করিয়াছিলেন সেই পুণ্যপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া দরিদ্র ভারতের যুবকবৃন্দ বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

একে একে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহারাজ রামবর্ম্ম, স্যর মাধব রাও, স্যর সলর জঙ্গ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যর সৈয়দ আহম্মদ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, স্যর মথুস্বামী আর্য্য, শ্যামাচরণ সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, রাম দুলাল সরকার এবং স্যর জেমসেটজী জিজিভাইয়ের সাধনার পুণ্যপ্রসঙ্গ বিবৃত হইল। কর্ম্মক্ষেত্রে, সাধনভূমিতে, সাধক ইহাঁদের পুণ্যপ্রসঙ্গ শ্রবণে আশান্বিত হইবেন। এই সকল মহাপুরুষগণের সাধনার পুণ্যপ্রসঙ্গ ঘটনাবৈচিত্রে পূর্ণ। ইহাঁদের সাধনার মূলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়াছি। আর সেই সঙ্কল্পের অন্তরালে তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা দেখিয়াছি। এক্ষণে তাঁহাদের সাধনার পুণ্যপ্রসঙ্গের শেষে একবার তাঁহাদের কার্য্যকলাপের পুনরালোচনা করা যাউক। দেখা যাউক তাহা হইতে আমরা কি শিখিতে পারি। মহাপুরুষচরিত আলোচনা করিতে যাইলে আমরা সর্ব্ব প্রথমে কয়েকটী গুণ দেখিতে পাই। বিশ্বাস, আশা, সাহস এবং অধ্যবসায়ের চিহ্ন আমরা তাঁহাদের সর্ব্ব কার্য্যে দেখিতে পাই। ভগবানের কৃপায়, আত্মশক্তিতে এবং কর্ম্মের ঔচিত্যে ও উপকারিতায়

ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়। আশায় তাঁহারা ভগবানের অভয় ও আশ্বাসবাণী শ্রবণ করেন। মহাপুরুষগণ বীরপুরুষ। উত্তাপবিহীন বহ্নি যেমন নিরর্থক, সাহসবিহীন মহাপুরুষ শব্দও তেমনি নিরর্থক। সাহসের সাহায্যে মহাপুরুষগণ সকল ভয় অতিক্রম করেন, সকল বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হয়েন। আর অধ্যবসায়ের সাহায্যে প্রাণপাত করিয়া সাধনায় রত থাকেন। মহাপুরুষগণ উত্তম গুণ সম্পন্ন। তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া কবি যথার্থই বলিয়াছেন :—

বিঘ্নৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
আরব্ধমুত্তমগুণা: সততং বহন্তি।

মহাপুরুষগণ দায়ভাগ, মিতাক্ষরা বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার-বিধির অতীত উত্তরাধিকারিত্বে বিশ্বাস করেন। লোকে জায়াতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজেই যেমন পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়, মহাপুরুষগণ তেমনি প্রকৃতির গর্ভে কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্যই তাঁহারা অজর অমর হইয়া সর্ব্ব শুভকর্ম্মের চিন্তা ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাপুরুষগণের যে যে লক্ষণ বলা গেল, বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থ-বর্ণিত মহাপুরুষগণের চরিত্রে ঐ সকল গুণ দেখিতে পাইব। তাঁহাদের সাধনায় ঐ সকল গুণ ও ভাবের প্রবলতা দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আশান্বিত হইয়া সাধনায় রত থাকিতে পারিব, আর তাঁহাদেরই মত

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন
শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন"

এই মহাবাক্য বলিতে শিখিব।

সিদ্ধি।

সাধনা পুরুষকার-সাপেক্ষ। সিদ্ধি দৈবাধীন। ভগবানের একটী নাম সিদ্ধিদাতা। বাস্তবিক ভগবানই সিদ্ধিদান করেন। এবং সেই জন্যই সাধকগণ সিদ্ধি দৈবাধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কর্ম্মে মাত্র মানবের অধিকার, কিন্তু কর্ম্মফলে তাহার অধিকার নাই। সাফল্য মানবাধীন ব্যাপার নহে। মানব কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিবে। মানব কর্ত্তব্যের অনুরোধে সাধনা করিবে। সিদ্ধি, অসিদ্ধি, জয়, পরাজয় চিন্তা করা তাহার উচিত নহে। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। কি ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে আর কি কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই প্রকৃত সাধকগণকে ঐরূপ ভাবে সাধনা করিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা সিদ্ধি দৈবাধীন বলিয়া যেমন বিশ্বাস করেন তেমনই প্রকৃত সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করেন। ইহা তাঁহাদের অন্ধ বিশ্বাস নহে। কারণ HEAVEN HELPS THOSE WHO HELP THEMSELVES. তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন ভগবান ভক্তের অধীন। প্রকৃত সাধক ও ভক্ত একার্থ বাচক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সিদ্ধি দৈবাধীন ইতি বিশ্বাসের জন্য ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীরের সাধনার কোন ব্যাঘাত হয় না। অধিকন্তু মহাপুরুষগণ সর্ব্বকর্ম্মে দেশ কাল ও পাত্রের কথা সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া থাকেন। এবং সেই জন্য জীবদ্দশায় সাধনার সিদ্ধি না হইলে তাঁহারা নিরাশ বা ভগ্নহৃদয় হয়েন না। জীবন ও কাল যে অনন্ত তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন। জগত ও জীবের অনন্ত উন্নতিতে তাঁহারা ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করেন। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে "উত্তরাধিকারিত্বে" তাঁহাদের আশ্চর্য্য বিশ্বাস। সংসারী ও বিষয়ী লোক পুত্রপৌত্রাদির জন্য বিষয় বিভব করিয়া যান। মহা-

পুরুষগণ ও তেমনই জগতের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। জীবদ্দশায় সঙ্কল্পের বীজ সাধনা-সাহায্যে উদ্ভিন্ন না হইলে তাঁহারা বীজের শক্তিতে সন্দিহান হয়েন না। কালে তাঁহাদের উপ্ত বীজ উদ্ভিন্ন হইবে, পরে তাহাই পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইবে এবং যথা সময়ে তাহা ফলবান্ হইবে ইহা তাঁহারা আশার চক্ষে দেখেন এবং চাক্ষুষ সত্যের ন্যায় বিশ্বাস করেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে বা কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চ অঙ্গের সাধকগণ সিদ্ধির বিষয় এইরূপই ভাবিয়া থাকেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সাহিত্যশিল্পবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণকে উচ্চ অঙ্গের সাধক বলা যায়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের জীবনী পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তাঁহারা জীবদ্দশায় সাধনার আংশিক সিদ্ধিমাত্র দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুর বহুকাল পরে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম জনসাধারণে গ্রহণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব জীবদ্দশায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বহুল প্রচার দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে প্রিয়দর্শন অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। মহাত্মা যীশু যখন ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করেন তখন তাঁহার কয়জন শিষ্য ছিলেন? স্বীয় দেহের শোণিত দিয়া যে ধর্ম্মের বীজ জগতে বপন করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে তাহা অঙ্কুরিত হয়। এক্ষণে সেই অঙ্কুর মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া কত শত নরনারীকে শান্তি দিতেছে। মহম্মদও জীবদ্দশায় অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। নানক এবং শ্রীচৈতন্যও জীবদ্দশায় তাঁহাদের সাধনায় অনেক বিঘ্ন পাইয়াছিলেন। যাহারা এই সকল মহাপুরুষগণকে তাঁহাদের জীবদ্দশায় নিগৃহীত করিয়াছিল, ইঁহাদের সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল, ইঁহাদের কার্য্যের সাফল্যে সন্দেহ করিয়াছিল, তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল, তাহারা কত অদূরদর্শী ছিল এখন

আমরা তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু মহাপুরুষগণ তখনই তাহাদিগকে অদূরদর্শী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্য সাধনায় কখন শিথিল-প্রযত্ন হয়েন নাই। কালে যে তাঁহাদের সাধনা সফল হইবে ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এখন আমরা কার্য্যতঃ তাঁহাদের বিশ্বাসের সাফল্য বুঝিতেছি। ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মবীরগণ সম্বন্ধে এখানে অতি সংক্ষেপে যাহা উল্লেখ করা গেল তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে তাঁহারা সিদ্ধি সম্বন্ধে কি ভাবিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে শিল্প-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কথা সমালোচনা করিলেও দেখিতে পাইব যে তাঁহারা আপন আপন জীবদ্দশায় সাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। বর্ত্তমানযুগে শিল্পবিজ্ঞানের নানা জটিল কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা তাড়িত ও বাষ্পের কথা উদাহরণপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি।

শিল্প বিজ্ঞান বিস্তার যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহারা সকলে জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধিলাভ করিয়া যাইতে পারেন না। কোথাও কোথাও কেহ কেহ কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব তাঁহাদের মৃত্যুর বহুকাল পরে সম্পূর্ণ হয়। অথবা "সম্পূর্ণ হয়" ইহাই বা কি করিয়া বলিব? বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল ক্রমবিকাশশীল। তাড়িৎ সম্পর্কীয় যে সকল সত্য মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন অবগত হইতে পারিয়াছিলেন সেইগুলিকে তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার সিদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে আমরা ভ্রমে পতিত হইব। ঐরূপ কথা বলিলে বৈজ্ঞানিক সত্যের গতির প্রসার খর্ব্ব করা হয়। ফ্রাঙ্কলিন যখন তাড়িৎ বিষয়ক কয়েকটী তথ্য আবিষ্কার করেন তখন তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে তাড়িৎ বিষয়ক আরও বহুবিধ তথ্য প্রকৃতির ভাণ্ডারে সুরক্ষিত ও লুক্কায়িত আছে। তাঁহার জীবন অবসান হইবার পরেও আরব্ধ সাধনার শেষ হইবে না।

অধিকন্তু তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তদীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই সাধনায় রত থাকিবেন এবং ক্রমে ক্রমে কঠোর সাধনাযোগে এক একটী সত্য প্রকৃতির নিকট হইতে অবগত হইবেন এবং তদ্দ্বারা জীব-জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং এরূপ স্থলে ফ্রাঙ্কলিন যে কয়টী তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সাধনার আংশিক সিদ্ধিমাত্র বলা যাইতে পারে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ—গ্যালভানি, গস, ওয়েবর, ষ্টীনহিল, হুইষ্টোন, মর্স, এডিসন, রঞ্জন, মারকণি, বসু প্রভৃতি সাধকগণ—তাড়িৎ তত্ত্ব সাধনায় বত থাকিয়া কত নূতন নূতন কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এইজন্য বলিতেছিলাম মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন আংশিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কে জানে কবে এ কঠোর সাধনার সর্ব্বাঙ্গীণ সিদ্ধি হইবে।

বাষ্পশক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। জেমস্ ওয়াট্ সাধনায় যে ফললাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পরবর্ত্তী টে্রবিথিক এবং ভিবিয়ান সে সাধনায় অধিকতর ফললাভ করিয়াছিলেন। শেষে রবার্ট ষ্টিফেন্সন যথারীতি বাষ্পীয় পোতাদি চালাইয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধক-গণের অপেক্ষা অধিকতর সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানযুগে দৈহিক শক্তি ও বাষ্পশক্তিতে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। শকট ও অর্ণবযানচালন, মুদ্রণ, বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য হইতে প্রকোষ্ঠে বায়ুব্যজন পর্য্যন্ত বাষ্পশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। * ওয়াট, টে্রবিথিক, ভিবিয়ান, ষ্টীফেন্সন প্রমুখ সাধকগণ তাঁহাদের সাধনার যে ফল পাইয়া-ছিলেন তাঁহাদের ভবিষ্যবংশীয়গণ সেই সাধনভূমিতে অধ্যবসায়

* তাড়িৎ শক্তিদ্বারা বাষ্পশক্তিকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে এবং বহুবিধ কল কারখানাও তাড়িৎ শক্তিতে এখন চালিত হইতেছে।

সহকারে সাধনা করিয়া উত্তরকালে আরও কত অচিন্তনীয় অভিনব শক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া জীবজগতের কত কল্যাণ করিবেন তাহার ইয়ত্তা এখন কে করিতে পারে ?

তাড়িত ও বাষ্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের সাধনা ও সিদ্ধির কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল মাত্র। বিজ্ঞানের বহু বিভাগ আছে এবং সে সকলের বহুতর সাধক আছেন। এখানে সে সকল কথার আলোচনার আবশ্যক নাই। উদাহরণের জন্য যাহা বলা হইল তাহা হইতে আমরা এই বুঝিলাম যে, যাঁহারা কর্ত্তব্যবোধে সাধনা করিবেন তাঁহাদের সিদ্ধির জন্য একান্ত ব্যগ্র হওয়া ঠিক নহে। সাধনায় দেহপাত করাতেও শ্রেয়ঃ আছে। প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলেও সাধনাতে যে সন্তোষ পাওয়া যায়, একথা প্রত্যেক সাধকই অবগত আছেন। সাধনায় গৌরব আছে, সম্মান আছে। সাধন-ভূমিতে সাধনা কবিতে করিতে যাঁহারা দেহপাত করেন তাঁহারাও সিদ্ধ-পুরুষগণের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রকৃত সাধকের পক্ষে ইহা বড় সামান্য সাধনা নহে। সাধু সঙ্কল্প লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও আশার সহিত সাধনা করিতে হইবে। ইহাতে জীবদ্দশায় যদি সিদ্ধিলাভ ঘটে ত পরম মঙ্গল। অন্যথা দুঃখিত বা ভগ্নোদ্যম হওয়া উচিত নহে। কারণ প্রকৃত সাধনা কখন ব্যর্থ হয় না। কালে সাধনা সফল হয়। নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও আশার সহিত সাধনা করিলে যথাসময়ে সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি দেন ইহাই সিদ্ধিপুরুষগণের উক্তি। প্রকৃত সাধক উহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং সাধনাই সিদ্ধির সুগম পথ।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সাধনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে তাঁহার সাধনার ফল তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ভোগ করিতেছেন এবং উত্তরকালে আরও অধিকতর ভাবে করিবেন। ব্যক্তিগত সুখ

সুবিধা মান সম্ভ্রমের কথা উত্থাপন করিতে গেলে এ কথা স্পষ্টই বলিতে হইবে যে রাজা রামমোহন রায় ঐ সকল বিষয়ে সৌভাগ্যবান্ ছিলেন। তিনি দেওয়ানের কর্ম্ম বিশেষ খ্যাতি ও সম্মানের সহিত করিয়াছিলেন। রংপুরে দেওয়ানী কর্ম্ম ত্যাগ করার পর তিনি পৈত্রিক বিষয় বিভবের একমাত্র অধিকারী হওয়াতে তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দের অভাব ছিল না। হিন্দু সমাজের মধ্যে তাঁহার অনেক শত্রু ছিল সত্য ; কিন্তু তথাপি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতার জন্য দেশের উচ্চতম রাজপুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা সম্রাটের কতকগুলি কার্য্যের জন্য এবং স্বদেশের হিতের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেই সুদূর দেশেও তিনি যথেষ্ট আদর ও সম্মান পান। ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়মের অভিষেক উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায় ইয়ুরোপীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণের সহিত সমান সম্মান পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়ম তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তাহার পর রাজা যখন ফরাসী দেশে গমন করেন তখন সেই দেশের রাজা লুইফিলিপ রাজা রামমোহন রায়কে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করেন। ফরাসীরাজ লুইফিলিপ দুইবার রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার সহিত আহার করেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার গুণগ্রামের কথা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন অনেক সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত রাজার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেল রাজার কথা বলিয়া গিয়াছেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্রাউহাম সাহেব তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। উইলিয়ম রস্কো রাজার সহিত পরিচিত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হয়েন। ঋগ্‌বেদ সংহিতার অনুবাদক রোজেন সাহেব রাজার সহিত বেদ বিষয়ে

অনেক কথাবার্ত্তা কহেন। জনহিতৈষী দার্শনিক বেন্থাম রাজার গুণগ্রামে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে মানবহিতৈষী বলিয়াছিলেন। বিদেশে অবস্থান কালে তিনি এইরূপে সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। সাধক বলিয়া তিনি ঐরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন। স্বদেশের হিতসাধনা করিতে করিতে রাজা বিদেশে দেহত্যাগ করেন। ব্রিষ্টলে তাঁহার সমাধি হয়। উহা এখন স্বদেশ-হিতৈষিগণের পুণ্যতীর্থ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। সেই সমাধির উপর রাজার সাধনার কথা সংক্ষেপে এইরূপ লিখিত আছে :—

"Beneath this stone rest the remains of RAJA RAM MOHAN ROY. A conscientious and steadfast believer in the unity of Godhead, he consecrated his life with entire devotion to the worship of the Divine Spirit above. To great natural talents he united a thorough mastery of many languages, and early distinguished himself as one of the greatest scholars of the day. His universal labours to promote the social, moral and physical condition of the people of India, his earnest endeavours to supress idolatry and the rite of Sati, and his constant, zealous advocacy of whatever tended to advance the glory of God and the welfare of man, live in the grateful remembrance of his countrymen."

কীর্ত্তিমন্দিরে ভক্তগণের ভাষায় সাধক ও সিদ্ধপুরুষগণের স্তুতি-গান করা পুণ্যকর্ম্ম। একজন বৈদেশিক ভক্ত—ভট্ট মোক্ষমূলর—রাজার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া রাজার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

The German name for Prince in Furst ; in English First—he who is always to the fore ; he who courts the place of danger ; the first in fight the last in flight.

Such a Furst was RAMMOHAN ROY—a true prince, a real Raja, if Raja also, like Rex originally meant the steersman, the man at the helm.”

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একজন পরম ভক্তের স্তুতিগাথায় আমরা রাজার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার কথা এখানে শেষ করিতেছি। ভারতীয় যুবকগণ তাঁহার স্তুতিগাথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

“ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদরাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নহে। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয়ে জঙ্গলময় পঙ্কিল ভূমি পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্যপবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূলপক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহা যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশে জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়িরূপ দুর্ম্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ এবং বিচার যুদ্ধে সকল বিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপ জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটী সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তর

কালীন সুমার্জ্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দু জাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার পতাকা তাঁহাদের স্বাধিকারের মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারত-বর্ষের কেন, তুমি জগতের বন্ধু।" (অক্ষয়কুমার দত্ত)

মহারাজ রাম বর্ম্ম রাজসিংহাসনে বসিয়া যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহা বিফলে যায় নাই। মহারাজের আদর্শ আমাদের দেশীয় রাজন্য-বর্গের নিকট চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে। স্বীয় রাজ্যের উন্নতিকল্পে অসাধারণ সাধনা সাহায্যে মহারাজা যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার স্মৃতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে চিরকাল রক্ষিত হইবে। ত্রিবাঙ্কুরের শিল্প বিদ্যালয়, কুইলনে কাপড়ের কল, পুনালুরের কাগজের কল, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার সিদ্ধির অন্যতম পরিচয়।

মহারাজের বিবিধ বিষয়ের সাধনার পরিচয় পাইয়া বিভিন্ন দেশের বিদ্বৎসমাজ তাঁহাকে নানা উপাধিতে সম্মানিত করেন। বিবিধ সজ্জন সমাজের সহিত তাহার নাম গ্রথিত আছে। মান্দ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম সভ্য ছিলেন। বিদেশে লিনিয়ান সোসাইটী তাঁহার উদ্ভিদ্বিদ্যার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সদস্যের পদে বৃত করেন। ভৌগোলিক সমাজ তাঁহাকে সভ্য নিযুক্ত করেন। মহারাজ বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার অত্যধিক বিদ্যানুরাগের কথা সুদূর ফরাসী দেশেও প্রচারিত হয়; তত্রস্থ

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে Officer de l' Instruction Publique পদে বৃত করিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পারিস নগরস্থ Socie´te´ des etente Colonial a Maritime সমাজ তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে Knight Grand Commandership of the most Exalted order of the Star of india উপাধিতে বিভূষিত করেন।

কথিত আছে, স্বদেশে রাজা পূজিত হয়েন কিন্তু বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। রামবর্ম্ম উভয় গুণের অধিকারী ছিলেন। রাজা হইয়া সাধন গুণে তিনি বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েন এবং সেই জন্য কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছেন। তাঁহার সাধনার ফল তিনি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

স্যর মাধব রাও ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যে যে যে হিতকর সংস্কারের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বিবিধ হিতকর বিধান তাঁহারই কীর্ত্তির পরিচায়ক। সচিব প্রবর ত্রিবাঙ্কুর ও হোল-কার রাজ্যে যে সকল শুভকার্য্যের সূচনা করিয়া আসেন কালে সেগুলি সম্পন্ন হইয়া তাঁহারই অদম্য ইচ্ছাশক্তির কথা প্রচার করিতেছে।

সচিব প্রবরের প্রধান সাধনক্ষেত্র বরোদা, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই খানে চিরবন্ধুর রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সাধনা করিয়া-ছিলেন তাহাতে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তন্ত্রে সিদ্ধপুরুষগণ সম্বন্ধে কথিত আছে যে তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন করিতে পারেন। সচিব স্যর মাধব রাও রাজনীতিক্ষেত্রে যে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন তাহা দ্বারা তিনিও ইচ্ছামাত্রে বরোদার কত অসাধারণ ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় বরোদার রাজশ্রী বৃদ্ধি

পায়। সেই কর্ম্মবীরের চেষ্টাতে গাইকোয়াড়ের রাজ্য মধ্যে নানা স্থানে সুবিচারের জন্য ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিবিধ জ্ঞানের আগার পুস্তকালয় এবং অন্যান্য বহুবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। সুশাসনের জন্য, রাজকার্য্য সুন্দররূপে পরিচালনার জন্য, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতে অনেক শিক্ষিত চরিত্রবান ও কর্ম্মঠ লোক আনাইয়া নিযুক্ত করেন। সচিব প্রবর এই শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করিয়া রাজার ও রাজ্যের অশেষ কল্যাণ করিয়াছিলেন। কারণ শাস্ত্রে কথিত আছে ঃ—

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানেহি সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গ নিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ।

প্রকৃত পক্ষে তাঁহার এই প্রকার সুবন্দোবস্তের জন্য গাইকোয়াড়ের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল।

স্যর মাধব রাওয়ের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের সফলতা দেখিয়া বাস্তবিক তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার কঠোর সাধনার্জ্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কুশলতার জন্য তাহার সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও তাঁহার পরামর্শ, উপদেশ এবং সাহায্য পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। বরোদার রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পরও তিনি মান্দ্রাজের গভর্ণর ও গভর্ণর জেনেরেল কর্ত্তৃক মন্ত্রণা-সভায় আহুত হয়েন। জর্ম্মানগণ কর্ত্তৃক আফ্রিকার অধিকার বিষয়ে তিনি প্রিন্স বিসমার্ককে পরামর্শ দেন। এবং এজন্য সেই স্বনামখ্যাত জার্ম্মান মন্ত্রী স্যর মাধব রাওকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দেন। স্যর মাধব রাওয়ের সুপরামর্শ জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত করিয়া প্রত্যেক জার্ম্মান সৈন্যকে দেওয়া হয়। সচিব প্রবরের উপদেশের মূল্য যে কত মূল্যবান তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। তিনি স্বদেশের হিতকল্পে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় যুবকগণ স্যর মাধব

রাওয়ের জীবন এবং উপদেশ উভয় হইতেই শিক্ষা লাভ করুন এবং দেখান যে শিক্ষিত সচ্চরিত্র ও কর্ম্মঠ ভারতীয় যুবক সর্ব্ব প্রকারে রাজা ও রাজ্যের সেবা করিবার উপযুক্ত।

মহাপুরুষগণের গুণ গান করিলেও পুণ্য হয়। তদ্দ্বারা লোকে সদ্‌গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দুইজন প্রথিতনামা ইংরাজ স্যর মাধব রাওয়ের যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Within the short space of a year, MADHAVA RAO has called forth order out of disorder; has distributed justice between man and man, without fear or favour; has expelled dacoits; has raised the revenues; and his minutes and State papers show the liberality, the soundness and statesmanship of his views and principles. He has received the thanks of his sovereign; he has obtained the voluntary admiring testimony of some of the very missionaries who memorialized, to the excellence of his administration. Now, here is a man raised up as it were amid the anarchy and confusion of his country to save it from destruction. Annexation looming in the not far distant future, would be banished into the shades of night if such an administration as he has introduced into two of the districts were given to the whole kingdom, by his advancement to the post of Minister. He is, indeed, a splendid example of what education may do for Native. "John Bruce Norton."

সচিব মাধব রাও দেশীয় রাজন্যবর্গের মন্ত্রিত্ব করিলেও ব্রিটিসগভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং ইংরাজরাজ তাঁহার গুণের আদর করিতে ত্রুটী করেন নাই। ১৮৭৮ সালের দিল্লীর দরবারে তিনি "রাজা" উপাধি পান। তৎপূর্ব্বে K.C.S.I. উপাধি পান। এই

উপলক্ষে মান্দ্রাজের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড নেপিয়র সচিবপ্রবরের যে প্রশংসাবাদ করেন তাহা উল্লেখ যোগ্য।

"Sir Madhava Rao—The Goverment and the people of Madras are happy to welcome you back to a place where you laid the foundation of those distinguished qualities which have become conspicuous and useful on another scene. The mark of Royal favour which you have this day received will prove to you that the attention and generosity of Our Gracious Sovereing are not circumscribed to the circle of her immediate dependents but Her Majesty regards the faithful service rendered to the Princes and people of India beyound the boundaries of our direct adminstration, as rendered to Herself and to her representatives of this Empire. Continue to serve the Maharaja industriously ond wisely, reflecting the intelligence and virtues of His Highness faithfully to His people."

বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে সচিব প্রবর স্যর মাধব রাওয়ের ন্যায় স্যর সলরজঙ্গও একজন কৃতী পুরুষ। হায়দ্রাবাদের কল্যাণের জন্য তিনি যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সে কঠোর সাধনায় তিনি অনুরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নিজামের মঙ্গল কামনায় তিনি আপনার ধন প্রাণ সমূহ বিপন্ন করিয়াও নিজামের সৈন্যগণকে বিদ্রোহী সিপাহীগণের সহিত মিলিত হইতে দেন নাই। সমগ্র হায়দ্রাবাদ এক দিকে—আর স্যর সলরজঙ্গ এক দিকে। ইংরাজের মঙ্গলে ভারতের মঙ্গল—ভারতের মঙ্গলে হায়দ্রাবাদের মঙ্গল একথা সলরজঙ্গ বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন। সমস্ত রাজ্যের আগ্রহ স্যর সলরজঙ্গের ইচ্ছাশক্তির নিকট পরাভূত

হইয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তির এতাদৃশ প্রবলতা সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবে না। ব্রিটিস্‌রাজ গুণগ্রাহী। স্যর সলরজঙ্গের বন্ধুতা ও দূরদর্শিতার জন্য ইংরাজ রাজ বিদ্রোহান্তে সুখের দিনে তাঁহাকে ৩০০০০৲ টাকা মূল্যের একটী বিখ্যাত উপহার দেন। এবং এই সময়ে তদানীন্তন বড়লাট তাঁহার দক্ষতা সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্যর সলরজঙ্গ তদীয় অসাধারণ সাধনাসম্ভূত অভিজ্ঞতা ও শক্তির দ্বারা নিজামের রাজ্যকে নানা প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিল। যে নিজামকে এক দিন কেহ সামান্য ঋণ দিতে ইতস্ততঃ করিত, সেই নিজামের কোষাগার সলরজঙ্গের বন্দোবস্তের গুণে ধনরত্নে পূর্ণ হয়। এ সকলই তাঁহার সাধনায় সিদ্ধির পরিচয় মাত্র। শেষে সকলেই তাঁহার অনন্য সাধারণ শক্তির পরিচয় পান এবং তাঁহাকে তদনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে G. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত করেন। স্যর সলরজঙ্গ যখন নিজামের হিতার্থে বিলাত যান তখন অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি D. C. L. উপাধি পান। লণ্ডনের লর্ডমেয়র তাঁহাকে লণ্ডনের নাগরিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করেন। এইরূপে কি স্বদেশে কি বিদেশে তিনি সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন। মহাপুরুষকে সম্মান করা মনুষ্যোচিত কার্য্য। বীরপূজা বীরের লক্ষণ। গুণীই গুণের আদর করিয়া থাকেন। যে দিন ভারতের যুবকগণ বীর পূজা করিতে শিখিবেন সেই দিন ভারতের সৌভাগ্যের সূচনা হইবে। ভগবান করুন সে দিন নিকট হউক। শিক্ষা ও সৌভাগ্যবলে যে সকল ভারতীয় যুবক রাজনীতি ক্ষেত্রকে কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিবেন তাঁহারা যেন স্যর মাধব রাও এবং স্যর সলরজঙ্গের উজ্জ্বল আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েন, এবং

তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন, আর তাঁহাদেরই মত ব্রিটনের বন্ধু হইয়া রাজা এবং রাজ্যের সেবা করেন।

স্যর সলরজঙ্গের জীবদ্দশায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতেও ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সেইরূপ সসম্মান শোক প্রকাশ করেন। স্যর সলরজঙ্গের মৃত্যুর পর ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট Gazette Extra ordinary তে এইরূপ লেখেন :—

"It is with feeling of great regret that the Governor General in Council announces the death of His Excellency NAWAB SIR SALAR JUNG G. C. S. I., the Regent and Minister of the Hyderabad State. By this unhappy event the British Government has lost an enlightened and experienced friend, His Highness the Nizam, a wise and faithful servant, and the Indian Community one of its most distinguished representatives."

ব্রিটিস বঙ্গে এ পর্য্যন্ত যত কর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান। বঙ্গের অশেষবিধ কল্যাণসাধনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় অতি অল্প লোকই সমগ্র মন প্রাণ দিয়া খাটিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত। বিদ্যালয়ে, বঙ্গসাহিত্যে, জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে, সমাজ সংস্কারে তিনি সাধনা করিয়াছেন। আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাঁহার সমগ্র সাধনা ও তাঁহার সিদ্ধির সবিশেষ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। আমরা তাঁহার বিদ্যালাভ ও বিদ্যাবিস্তারের কথাই মুখ্যতঃ বলিয়া আসিয়াছি। কিরূপ কঠোর সাধনা করিয়া তিনি বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন পূর্ব্বে তাহা সবিস্তর কথিত হইয়াছে। দরিদ্র বাঙ্গালী ছাত্র তাঁহার উজ্জ্বল ও পবিত্র আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়া

গৌরবান্বিত হউক। বিদ্যাসাগরের বাল্যের সহিত দারিদ্র্য সংযুক্ত থাকাতে যেন ছাত্রের পক্ষে দারিদ্র্য শ্লাঘনীয় হইয়াছে। জ্ঞান সাধনায় ঈশ্বরচন্দ্র সিদ্ধি লাভ্ করিয়া বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত পক্ষেই বিদ্যাসাগর ছিলেন।

বঙ্গদেশে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেই সঙ্কল্পের তিনি মহীয়সী সাধনা করিয়াছিলেন। সে সাধনায় তিনি মনোমত সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকাবলী আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘবে বিদ্যা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে কত শত ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনে যশস্বী হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজ আজ বেসরকারী কলেজের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এখন ভারতবর্ষে কত কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা দেশে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। আজ ভারতের শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তনকালে সকলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দোহাই দিতেছেন। শিক্ষিত বঙ্গের গৃহে গৃহে বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। তাঁহার সেই পবিত্র প্রতিমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া ভক্তিভরে প্রাচীন বঙ্গ, নবীন বঙ্গকে পরিচয়চ্ছলে প্রতিনিয়ত যেন বলিতেছেনঃ—

"শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোঽয়ং বিদ্যাসাগর-সংজ্ঞক
ভূদেবকুলসম্ভূতো মূর্ত্তিমদ্দৈবতং ভুবি"!

পূর্ব্বে বলিয়াছি ঈশ্বরচন্দ্রকে সগুণ ঈশ্বরের ন্যায় নানা লোকে নানা ভাবে পূজা করেন। দীন জন তাঁহাকে দয়ার সাগর নাম দিয়াছেন। তাঁহাদেরই এক জন দুঃখের দিনে বিদেশে বিপন্ন হইয়া বিদ্যাসাগরের যে স্তুতি গান করিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ যোগ্য। বঙ্গের সেই দীন অমর কবির কথায় আমরাও সেই মহাপুরুষের পূজা করিয়া ধন্য হই।

বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে!
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে!
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ সদনে।—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাস-রূপ ধরি;
পরিমলে ফুলকুল দশদিশ ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

কর্ম্মবীর মহাপুরুষ ঈশ্বর চন্দ্র বাঙ্গালীর চক্ষে সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধপুরুষের পূজা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সেই বিশ্বাসে শিক্ষিত বঙ্গ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

যাও দেব স্বর্গপুরে, করগে বিশ্রাম
পাইয়া দেবের দয়া ভুল না সকল মায়া
স্মরিও স্মরিও দেব ভারতের নাম।
অভাগিনী বঙ্গভাষা করিও মঙ্গল আশা
বালবিধবার প্রতি হ'য়ো নাকো বাম।
দরিদ্র বাঙ্গালীগণে জাগাও জাগাও মনে
মরণে না হয় যেন চির পরিণাম।"

বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে স্যর সৈয়দ আহম্মদের

স্থান অতি উচ্চ। অনেকে বিবেচনা করেন স্যর সলরজঙ্গের পরই স্যর সৈয়দের নাম উল্লেখ যোগ্য। তুলনায় সমালোচনার আবশ্যক নাই। প্রত্যেককে তাঁহার সাধনভূমিতে দেখিয়া তাঁহার সিদ্ধির কথা আলোচনা করায় লাভ আছে। আলিগড়ের এ, ও, কলেজ স্যর সৈয়দের প্রধান কীর্ত্তি-মন্দির। মুসলমান সম্প্রদায়ের সুশিক্ষার জন্য যে মহীয়সী সাধনা স্যর সৈয়দ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কৃতী পুরুষ ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ প্রায় সকল কর্ম্মেই তিনি সফলকাম হয়েন। তাঁহার দেহান্তের পর মুসলমান সম্প্রদায়ের সুশিক্ষার জন্য এবং তাঁহার স্মৃতি স্থায়ী করিবার জন্য মহম্মদীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় মুসলমান-সমাজ বিশেষ প্রয়াস পান। তাঁহার স্মৃতিসভায় লর্ড এল্‌গিন উপস্থিত থাকেন। তিনি স্যর সৈয়দের স্বদেশ-প্রীতি স্বজাতি-হিতৈষিণা এবং রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চারের প্রয়াস বিশেষ ভাবে প্রশংসা করেন।

ভারতের পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান রাজাদের অনেক কীর্ত্তি আছে। দিল্লীতে কুতবমিনার এখনও উচ্চশিরে মুসলমান নৃপতির কাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া মিনার মন্দির-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা তত আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু প্রজা হইয়া সবিশেষ চেষ্টা করিয়া, ভিক্ষা করিয়া, সাধারণের হিতের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা অতিশয় প্রশংসার্হ। স্যর সৈয়দের প্রতিষ্ঠিত আলিগড়ের বিদ্যামন্দির এইরূপ প্রশংসার্হ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির দিল্লীর সন্নিকটস্থ নগরে স্থাপিত হইয়া দিল্লীর নৃপতিগণের স্থাপিত কীর্ত্তি-মন্দিরের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছে।

কি বর্ত্তমান সময়ে, আর কি সুদূর ভবিষ্যতে, যে কোন ভাবুক লোক ভারতের পশ্চিম প্রদেশে মুসলমানদিগের কীর্ত্তিকলাপ দেখিবার

জন্য যাইবেন, তিনি দিল্লীতে রাজার এবং আলিগড়ে প্রজার কীর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। অধিকন্তু তিনি তথায় মুসলমানগণের কৃতজ্ঞতাসিক্ত স্মৃতিক্ষেত্রে, জ্ঞানের আলোক হস্তে স্যর সৈয়দের মানষীমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

সংসারের সাধনা শেষ করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারানাথ ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কাশীবাস করেন। তিনি যখন সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। যে সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার তাঁহার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, তাহা তিনি, এক প্রকার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে তদীয় পুত্র এক শত সাত খানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সটীক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে নানাদেশের বিদ্যার্থিগণ বিদ্যা লাভ করিতেছেন। দেব ভাষা প্রচারের জন্য তিনি যে কঠোর এবং আজীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কর্ম্ম তাঁহার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল। কাশীতে যে অল্পকাল ছিলেন সে সময়েও তিনি সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন। রাজযোগ এবং হঠযোগের সাধন প্রক্রিয়াও অন্যান্য নিগূঢ় তত্ত্ব সকল দণ্ডী ও পরমহংসগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে আসিতেন। সাধক চিরকালই সিদ্ধপুরুষের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অন্যথা এই দণ্ডী সন্ন্যাসিগণ কিরূপে কাশীতে তাঁহার নিভৃতবাস জানিতে পারিলেন ?

কাশীতে অল্পকাল অবস্থানের পর তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দেহান্ত ঘটে। নিষ্ঠাবান ভক্ত হিন্দুর শেষ আশা পূর্ণ হইল। কাশীতলবাহিনী জাহ্নবী তীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁহার সৎকার হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারত প্রকৃত পণ্ডিত শূন্য হইল। এই মহামহোপাধ্যায়েরা মৃত্যুতে

দেশীয় হিন্দু রাজন্যবর্গ বিশেষ শোক প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে ত্রিবাঙ্কুরের গুণগ্রাহী মহারাজ রামবর্ম্ম বলেন যে, "তর্কবাচস্পতির মৃত্যুতে ভারতবাসী সংস্কৃত শাস্ত্রের সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত হইল।" মহীশূরের দেওয়ান রঙ্গাচার্লু বলেন যে, "আমাদের বিবেচনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই, কারণ, কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" তাঁহার বাচস্পত্যাভিধান ও অন্যান্য গ্রন্থ সমুদায় যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন তিনি জীবিত থাকিবেন। আর তাহাই প্রকৃত কথা।

"Thou art a monument without a tomb,
And art alive still while thy book doth live,
And we have wits to read and praise to give."

অনেকের ধারণা যে কোন দৃশ্যমান স্থায়ী কীর্ত্তি না রাখিতে পারিলে মহজ্জীবনের মহত্ত্ব থাকে না। এরূপ ধারণা সর্ব্বত্র ঠিক নহে। দেউল জাঙ্গাল, দীঘি, সরোবর, মঠ, মন্দির, দেবালয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ধরিত্রী এ সকল কীর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া এক শ্রেণীর সাধকগণের সিদ্ধির পরিচয় দিতেছে। অপর শ্রেণীর সাধকগণের কীর্ত্তি অশরীরিণী বাণী মানবের স্মৃতিতে রক্ষা করিয়া থাকেন। স্যর মথুস্বামী আর্য্যের মহজ্জীবনের কাহিনী স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়াছে। স্যর মথুস্বামী নিজের অসাধারণ সাধনার বলে দারিদ্র্য দানবকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্ম-কুশলতার গুণে ভারতবাসীর প্রাপ্য রাজকর্ম্মের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠকর্ম্ম পাইয়াছিলেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজিয়তি লাভ করা তাঁহার জীবনের কঠোর সাধনার অন্যতম সিদ্ধি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ছাড়া তিনি আর একটী বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেটী তাঁহার আদর্শ জীবন।

স্যর মথুস্বামীর ভক্তগণ তাঁহার তৈলচিত্র রাখিয়াছেন, শিল্পী

যথাযোগ্য বর্ণে তুলিকাযোগে সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু এই চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। তিনি নিজের চিত্র, আজীবনব্যাপী সময়ে স্বয়ং চিত্রিত করিয়াছেন। লোকের মানসক্ষেত্রে তিনি তাঁহার আদর্শ জীবন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সেই চিত্রে স্বাবলম্বন, সাহস, নিষ্ঠা, বুদ্ধি, বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, কর্ম্মকুশলতা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণের বর্ণসমষ্টি দেখিতে পাই। সেই আদর্শ জীবনের বর্ণ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই পিতৃমাতৃহীন যুবক মথুস্বামী স্বাবলম্বন সাহস এবং বুদ্ধির সাহায্যে বিবিধ বিদ্যালাভ করিতেছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মকুশলতার গুণে তিনি কৃতী পুরুষ। গার্হস্থ্যজীবনে দেব দ্বিজে একান্ত ভক্তিমান্, ক্রিয়াকাণ্ডে পরম নিষ্ঠাবান্ এবং পুত্র কলত্রে স্নেহ ও প্রেমশীল।

ব্রিটিস ভারতে দরিদ্র শিক্ষিত দেশীয় যুবকগণের আশার স্থল হইয়া মথুস্বামী আর্য্যের স্মৃতি চিরকাল জাগরুক থাকিবে। স্যর মথুস্বামী আর্য্য বিচারপতি হইয়া ব্রিটিসরাজের ন্যায় বিচারের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্বাবলম্বন থাকিলে, বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রে উপযুক্ত হইলে ইংরাজরাজ যোগ্য পাত্রের গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে কখন কুণ্ঠিত নহেন। ইহা বড় কম আশার কথা নহে। ব্রিটিসরাজের ন্যায়বিচার ও গুণগ্রাহিতার উপর নির্ভর করিয়া, স্যর মথুস্বামী আর্য্যের জীবনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মেধাবী সচ্চরিত্র বিদ্বান দরিদ্র দেশীয় যুবক আশান্বিত হৃদয়ে ইংরাজের ভাষায় চিরকাল বলিবে ঃ—

* * * * *
* * * * *

Act,—act in the living present,
Heart within, and God o'erhead.
Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime.

সকলের উদ্দেশ্য সমান নহে সুতরাং সকলের আদর্শও সমান হইতে পারে না। সকলের আকাঙ্ক্ষা উচ্চ নহে। সকলের শক্তিও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নহে। বুদ্ধদেব বা যীশু, সেকেন্দর বা নেপোলিয়ন, সেক্সপিয়র বা কালিদাসের আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি সকলের অনুকরণ যোগ্য নহে। ইঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অনেক কম আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, যাঁহাদের শক্তি অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প, তাঁহারা আপনাদের সম অবস্থাপন্ন লোকের সিদ্ধি দেখিয়া আশায় উদ্দীপিত হইয়া সাধনা করেন ইহাই পরামর্শসিদ্ধ।

এই হিসাবে শ্যামাচরণ সরকারের সিদ্ধি, সাধারণ সদিচ্ছাসম্পন্ন সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবকের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ। যে দরিদ্র যুবক চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে, সহায় সম্পত্তি না থাকায় ভাগ্যকে নিন্দা করিতেছে, বয়োধিক্যের জন্য বীতরাগ বা ভগ্নোদ্যম হইয়াছে, অথবা অনন্যসাধারণ প্রতিভা, অত্যন্ত প্রখরা স্মৃতি বা বুদ্ধি নাই বলিয়া দুঃখিত, সে একবার শ্যামাচরণ সরকারের উজ্জ্বল আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক, তাহার সমস্ত সংশয় দূরে যাইবে। হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইবে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহার সিদ্ধি দেখিয়া সে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। শ্যামাচরণ সরকার বাল্যে দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত ছিলেন—তাঁহার সহায় সম্পত্তি বা অলৌকিক প্রতিভা ছিল না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ ছিল না। অবস্থার উন্নতি করিয়া সম্পন্ন গৃহস্থের ন্যায় নিজ পরিবার এবং সাধ্যানুসারে সমাজ ও স্বদেশের সেবা করিবেন এই আশা তিনি সতত হৃদয়ে পোষণ করিতেন। এই শুভ সঙ্কল্প তিনি আজীবন ধ্রুবতারার ন্যায় সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" এই নীতি বাক্যের অনুসরণ করিয়াছেন। যে বয়সে বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণ ক্ষীণদৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া চোগা

চাপকান, সামলা ও চসমায় সুশোভিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, এবং সময়ে সময়ে, ব্যর্থমনোরথ হইয়া সংসারবিরাগী হইতে চাহেন, সেই বয়সে শ্যামাচরণ ইংরাজী বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করেন। আবার যে বয়সে বাঙ্গালী জরাগ্রস্ত হইয়া বিষয়কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া থাকেন, সেই বয়সে প্রবীণ শ্যামাচরণ নবীনের উদ্যমের সহিত ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদ লাভের জন্য বিচক্ষণ দক্ষ ইংরাজ ব্যবহার-জীবীদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া প্রভূত যশ ও অর্থ লাভ করেন। ঐ অধ্যাপকতার বৃত্তি দশ সহস্র মুদ্রা। এই উপলক্ষে তাঁহার সঙ্কলিত মহম্মদীয় দায়াধিকার বিষয়ক আইন গ্রন্থ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বিষয় ব্যাপারে ভিন্নমত হইলে এখনও মৌলভী, মুফ্‌তি, কাজি ও ইমামগণ এই গ্রন্থের মত প্রামাণ্য বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। শ্যামাচরণ উর্দ্দূ, পারসী ও আরবী ভাষায় জ্ঞান লাভের জন্য যে সাধনা করিয়াছিলেন, মহম্মদীয় ব্যবহারগ্রন্থে তাহার সিদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আবার সংস্কৃত কালেজে যখন শিক্ষকতায় ব্যস্ত, তখন ছাত্র হইয়া তত্রত্য মহা-মহোপাধ্যায়গণের অন্তিকে যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করিয়া-ছিলেন তাহার সিদ্ধি তাঁহার সঙ্কলিত ব্যবস্থাদর্পণ ও বাবস্থাচন্দ্রিকায়। বঙ্গের প্রধানতম বিচারালয়ে যখন তিনি দ্বিভাষীর কর্ম্ম করেন সেই সময়ে, অবসর অনুসারে, তিনি উক্ত গ্রন্থদ্বয় সঙ্কলন করেন। উহার একখানি, তৎকালীন উচ্চ শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। শ্যামচরণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে নয়টী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাস্তবিক ভাগ্যদেবতার কোন অজ্ঞাত নির্দ্দেশে তিনি উকীলের ব্যবসা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, অন্যথা তিনি ত উকীল-গণকে আইন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্যামাচরণের জীবন প্রতিভার কিরীট-চ্ছটায় মণ্ডিত নহে সত্য, কিন্তু পরিশ্রমার্জ্জিত গুণগ্রামে তাহা শোভিত।

তাঁহার জীবনের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইবার বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহাতে শুনিবার, বুঝিবার এবং শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। অবস্থাবিপাকে বিপন্ন হইয়া দারিদ্র্যে বাল্য ও যৌবনের বহুদিন কাটাইয়া, নির্ম্মল চরিত্র, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের গুণে উচ্চ রাজকর্ম্ম, সম্পন্ন গার্হস্থ্যজীবন, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কম প্রশংসার কথা নহে। শ্যামাচরণের সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনী বহুকাল বঙ্গে থাকিবে এবং সম অবস্থাপন্ন সাধকগণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে। জীবনে মরণে যাঁহার সিদ্ধির এরূপ সার্থকতা, তিনি ধন্য।

প্রাণ পাইতে হইলে প্রাণ দিতে হয়। অমর হইতে হইলে মরিতে হইবে। এখন যাঁহার সিদ্ধির কথা বলিতেছি, তিনি বাস্তবিক দেহ পাত করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সত্য সত্যই শরীর পতন করিয়া মন্ত্রের সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প কিরূপ দৃঢ় ছিল তাহা তিনি একস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে উহা উদ্ধরণ-যোগ্য :—"যে শুভকর বিষয়ে একবার কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, পার্য্যমাণে দূরে থাকুক, অপার্য্যমানেও তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টের বিষয়।" অক্ষয়কুমারের মহীয়সী সাধনার উপযুক্ত সঙ্কল্প। এইরূপ সঙ্কল্প ও সাধনা না হইলে সিদ্ধি কোথায়?

বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের কীর্ত্তি অক্ষয়। জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে জাতীয় উন্নতি তাঁহার জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য তিনি যে কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী বঙ্গভাষার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। তিনি যখন সাহিত্যসেবা-ব্রত গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা প্রশংসার্হ ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে তখন কুৎসিত কবিতার প্রাধান্য ছিল। তৎকালীন পাঠক-সমাজের রুচিও বিকৃত ছিল। অক্ষয়কুমার গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ বিষয় সকল গদ্যে লিখিতে প্রয়াস পান এবং

তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন। তিনি ওজোগুণসম্পন্ন বাঙ্গালা গদ্যের স্রষ্টা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি সেই তেজঃপূর্ণ ভাষার সাহায্যে বঙ্গবাসিগণকে নীতিশিক্ষা দিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যে তিনি শিক্ষিত-বাঙ্গালী-সমাজকে অনেক তত্ত্ব শিখাইয়াছেন। এখনও তাঁহার চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বঙ্গীয় সমাজের সমূহ হিতসাধন করিতেছে। অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা ভাষাকে নবজীবন দিয়াছেন। অক্ষয়কুমার যখন বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করেন তখন বঙ্গভাষা জরাগ্রস্ত ছিল বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গভাষাকে নবজীবন দান করিয়া তিনি স্বয়ং জরাগ্রস্ত হয়েন। অক্ষয়-কুমারের এই অকাল বার্দ্ধক্যের কথা মনে উঠিলে স্বতঃই যযাতির পৌরাণিক কাহিনী মনে হয়। জরাগ্রস্ত যযাতি পুত্রের ঐকান্তিক ভক্তির জন্য জরামুক্ত হয়েন। পুরুর ন্যায় বঙ্গভাষাও উপযুক্ত পুত্রের জন্য গর্ব্বিত। কবি বোধ হয় সেই জন্যই "বঙ্গভাষার" মুখ দিয়া বলিয়াছেন ঃ—

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয় কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥

তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি মাতৃরূপা বঙ্গ-ভাষাকে জরামুক্ত করিয়া অক্ষয় যশের মালা পরাইয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করাতে বঙ্গদেশ ধন্য, বঙ্গভাষা অক্ষয়কুমারের দ্বারা সেবিত হইয়া ধন্য, আর অক্ষয়কুমার আপনাকে বঙ্গবাসী বলিতেন বলিয়া বঙ্গবাসী ধন্য!

বঙ্গের একজন কৃতী সাহিত্যসেবক, মহাপুরুষ অক্ষয়কুমারের সমুচিত সম্মানরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ

করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের তাদৃশ কারণ দেখি না। তৈলচিত্র, বা প্রস্তর বা পিত্তল-মূর্ত্তি রক্ষা করিলেই স্মৃতি-রক্ষা বা সম্মান করা হয় না। তিনি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের মনোরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি মনের দ্বারা জীবিত রহিয়াছেন; কারণঃ—"স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।"

কথিত আছে, তন্ত্রোক্ত সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ হয়েন, তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে সকলই করিতে পারেন। তাঁহাদের করস্পর্শে ধূলি মুষ্টি স্বর্ণে পরিণত হয়। শূন্যে জীবের আবির্ভাব হয়; মরুভূমি তৃণ লতা পুষ্প ফলে সুশোভিত হয়। তাঁহাদের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে, লোকে হাসে, কাঁদে। তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রে লোকে উদ্দীপ্ত হয়, শান্ত হয়। এমনি তাঁহাদের সাধনালব্ধ শক্তি। সাধনার এমনই মাহাত্ম্য, সিদ্ধির এমনই ঐন্দ্রজালিক শক্তি। মধুসূদন যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ইহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

তাঁহার মন্ত্রপূত লেখনী-স্পর্শে কতই না অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি "স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল" ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ সমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছেন। তাহা পাঠ-কালে তাঁহার ইচ্ছায় "ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বর্ত্তমানের ন্যায় জ্ঞান হয়—তাঁহারই নির্দ্দেশে "দেব দানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপ-শালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়" তাঁহারই ইচ্ছায় "কখন বা বিস্ময় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুল-লোচন হইতে হয়।"

বাস্তবিক সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদন অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়া-

ছেন। আজীবনব্যাপী সাধনালব্ধ সমগ্র শক্তি তিনি মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য সমালোচনা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে, অধিকন্তু তাহা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্যও নহে। মধুসূদন কি প্রকার সঙ্কল্প লইয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কি পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা দেখা গেল। যে সকল সাহিত্যসেবকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কারকের বা নূতন পথ-প্রদর্শকের গুরুভার লইতে চাহেন তাঁহারা মধুসূদনের অদম্য ইচ্ছাশক্তি নির্ভীকতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার বিবিধ ভাষায় অগাধ জ্ঞানের কথা সতত স্মরণ করিবেন। কেবল প্রতিভার দোহাই দিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিকে যদি প্রতিভা বলা যায়, তবুও কেবল তাহার সাহায্যে কোন কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয় না। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনা আবশ্যক। মধুসূদনের শতত্রুটী সত্ত্বেও তিনি সাহিত্যের জন্য যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য কিরূপ সাধনা-লব্ধ শক্তি লইয়া তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ তাঁহার সিদ্ধির পরিচয়। বঙ্গভাষাকে তিনি সমৃদ্ধি-শালিনী করিয়া গিয়াছেন এবং অক্ষয় শব্দসম্পদ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যে গৌড়জন নিরবধি আনন্দে সুধা পান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং বঙ্গভূমির মনঃ-কোকনদ কখনও মধুহীন হইবে না।

মধুসূদনের হৃদয়-কাননে কত শত আশালতা শুকাইয়া মরিয়াছে সত্য। কিন্তু বঙ্গভূমির নিকট যে আশা তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। শ্যামা জন্মদা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অমরতা দিয়াছেন। তিনি নরকুলে ধন্য। বঙ্গের সর্ব্বজন মনের মন্দিরে সদা তাঁহাকে স্মরণ করে। বঙ্গের অন্যতম প্রধান কবি তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়াছেন ঃ—

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর
অহে বঙ্গ-কুল-রবি,
যতদিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি ;—
আকর্ণ পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎরঞ্জন ভান,
মধুচক্র সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ
আনন্দ লহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন মণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধবকুলে
বীর অবয়ব বীরভাষা-প্রিয়
গউড় সন্ততি সার
প্রিয়ংবদ সখা প্রণয়ের তরু
কামিনী-কণ্ঠের হার ;
সাহিত্য কুসুমে প্রমত্ত মধুপ
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

ভারতভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইলেও ভারতবাসী দরিদ্র। দরিদ্র ভারতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বহুল বিস্তার আবশ্যক। যে সকল মহাত্মাগণ বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং দেশের ও দশের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামদুলাল সরকার এবং স্যর জেমসেট্‌জী জীজী ভাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য একথা পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে। তাঁহাদের সঙ্কল্প ও সাধনার কথা যথাস্থানে পর্য্যায়-ক্রমে তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের সিদ্ধির প্রসঙ্গ উপস্থিত। রামদুলাল সরকারের জীবনের যে সময়ের কথা এখানে বলিতেছি, সে সময়ে তিনি ভারতবর্ষের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সওদাগর। বিস্তৃত বাণিজ্য, প্রচুর অর্থোপার্জ্জন এবং ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা রাম-দুলাল সরকার জীবনকে ধন্য করিবেন, আশা করিতেন। তাঁহার আশা ফলবতী হইয়াছিল। তাঁহার সৌভাগ্যের সময়ের কথা আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রামদুলালের নিজের চারি খানি বাণিজ্য-জাহাজ ছিল। এই জাহাজ দ্বারা তিনি মার্কিণ ও ইংরেজের দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন। চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও তাঁহার বাণিজ্য-জাহাজের গতিবিধি ছিল। বণিক্‌প্রবর রামদুলালের সহিত সর্ব্বজাতীয় বণিক্‌গণের কারবার ছিল। এক সময়ে তিনি য়ুরোপীয় বণিক্‌গণকে তেত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া তাঁহাদের বাণিজ্যের সাহায্য করেন। তিনি ভারতে মার্কিণের বাণিজ্য বিস্তার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রামদুলাল মার্কিণ পোতাধ্যক্ষগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতজাত নানা পণ্যে তাঁহাদের জাহাজ পূর্ণ করিয়া দিতেন এবং তাঁহাদের আনীত পণ্যসমূহ ভারতের বাজারে লাভের সহিত বিক্রয় করিয়া দিতেন। কালে তিনি মার্কিণ বণিক্ সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তদ্দেশীয় বণিক্‌গণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। এমন কি, কোন মার্কিণ বণিক্, তাঁহার বাণিজ্যপোত রামদুলালের নামে নামাঙ্কিত করেন।

রামদুলাল সরকারের স্বদেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যাপারের কাহিনী শুনিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি স্বীয় মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত বাণিজ্যে সত্য সত্যই লক্ষ্মী বাস করিতেন। চঞ্চলা কমলা রামদুলালের জীবদ্দশায় তাঁহার গৃহে অচলা

হইয়াছিলেন। কমলার প্রসাদে তাঁহার বাল্যের অনেক আশা সফল হইয়াছিল। তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অর্জ্জিত অর্থ ভক্ত ও নিষ্ঠাবান হিন্দুজনোচিত ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করেন। তাঁহার গৃহে বহুশত আশ্রিতজন নিত্য অন্ন-পানে তৃপ্ত হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালায় কত আগন্তুক সাধু-সন্ন্যাসী পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। পুণ্যতীর্থ কাশীধামে তিনি শিবালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দু যে যে অনুষ্ঠান ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ড করিলে জীবনকে ধন্য ও সার্থক বিবেচনা করেন, রামদুলাল স্বীয় অর্জ্জিত অর্থে তাহার প্রায় সকলই করিয়াছিলেন।

রামদুলাল সরকারের নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প, সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনী বঙ্গদেশে বহুকাল প্রচলিত থাকিবে এবং এই দাসত্বপ্লাবিত দেশে স্বাবলম্বন ও বাণিজ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিবে।

সিদ্ধি ও শক্তি প্রায় স্থলে একার্থবাচক। সিদ্ধপুরুষ শক্তিশালী। সদিচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি শক্তি-সাহায্যে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পার্সী বণিক্ জেমসেটজী লক্ষ্মীর কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভূত অর্থবল ছিল। তিনি সেই অর্থের দ্বারা দেশ বিদেশে অনেক হিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে স্বদেশ ও স্বদেশীয়গণের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৩৭ খৃঃ অঃ সুরাটে খণ্ডপ্রলয়ের ন্যায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বিংশতি সহস্র লোক পথের ভিখারী হয়। ইহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিবামাত্র তিনি নগদ ৩৫০০০৲ টাকা ও চাউল বিতরণের জন্য পাঠাইয়া দেন। পার্সী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দির সংস্কার ও নির্ম্মাণের জন্য ৬০,০০০৲ টাকা তিনি দিয়াছেন। অশীতিসহস্র

মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত প্রশস্ত ধর্ম্মশালা অদ্যাপি বোম্বাই নগরীতে এই বণিক্-প্রবরের দয়ার কথা প্রচার করিতেছে। দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তিনি প্রসূতিগণের জন্য এক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ স্যর জেমসেট্‌জী জীজী ভাই শিল্প বিজ্ঞান বিদ্যালয় তাঁহারই কীর্ত্তি। মহারাষ্ট্র প্রদেশে এই মহাপুরুষের ক্ষুদ্র বৃহৎ দানের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী আছে। সে সকল দেখিলে ও শুনিলে নয়ন মন তৃপ্ত হয়। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের কথা শুনিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে ব্রিটিস রাজ্যের ব্যারোনেটের উপাধি দেন। ১৮৪২ খৃঃ অঃ এই উপাধি বিতরণ উপলক্ষে বোম্বাইয়ের তদানীন্তন গভর্ণর স্যর জর্জ এন্‌ডারসন যাহা বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"The dignity of Knighthood has amongst natives of Europe been considered as most honourable. To obtain this distinction has continually been the ambition of the highest minds and noblest spirits, either by deeds of most daring valour or by the exercise of the most eminent talent.

'You, by your deeds for the good of mankind, by your acts of princely munificence to alleviate the pains of suffering humanity, have attained this honour and have enrolled among the illustrious of the land.'

মহারাষ্ট্র প্রদেশে মহাপুরুষের পূজা হয়। যেখানে বীরত্বের আদর নাই সেখানে বীর জন্মে না। সেখানে মহাপুরুষের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভবে? বোম্বাইবাসিগণ, ১৮৫৬ খৃঃ অঃ ষষ্টি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে স্যর জেমসেট্‌জীর প্রতিমূর্ত্তি, তত্রস্থ টাউন হলে স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তির গলে কি সুন্দর জয়মাল্য রহিয়াছে! উহাতে যাহা লেখা আছে

তাহা এইঃ—"Sir Jamsetjee Jeejeebhai, Knight from British Government, in honour of his munificence and his patriotism." বোম্বাইবাসিগণ বীর পূজা করিয়াছেন—তাহার ফলে তাঁহারা ভারতের সুপুত্র জে, এন্, তাতাকে পাইয়াছেন। বীর পূজার এমনই ফল। আদর্শের এমনই মহিমা।

আদর্শের মহিমা অনন্ত। আদর্শের দ্বারা মানব অনুপ্রাণিত হয়। অবসন্ন মন প্রাণ উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যাঁহাদের সঙ্কল্প, সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্যপ্রসঙ্গ কথিত হইল, কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় যুবকগণের নিকট তাঁহারা চিরকাল আদর্শ স্বরূপ থাকিবেন। কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে এই সকল কর্ম্মবীরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধনা করিতে পারিলে ভারতীয় যুবকগণ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। যুবকগণের জ্ঞানের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি বর্দ্ধিত হউক। তাঁহারা বীর পূজা করিতে শিক্ষা করুন। সিদ্ধপুরুষগণের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের শক্তি সঞ্চয় হইবে, কর্ম্মে আস্থা হইবে, সঙ্কল্প দৃঢ় হইবে, সাধনায় প্রবৃত্তি হইবে এবং ভগবানের কৃপায় সিদ্ধি নিকটতর হইবে। তখন দরিদ্র ভারতের সৌভাগ্যের উদয় হইবে, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়াছেনঃ—

আরভেতৈব কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ,
কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে।

সমাপ্ত।

কর্ম্মক্ষেত্রের সমালোচনা।

REVIEWS OF KARMAKSHETRA.

সমালোচনা।

স্বনাম-প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন ঃ—শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সেন মহাশয়ের প্রণীত 'কর্ম্মক্ষেত্র' নামক গ্রন্থ উপহার পাইয়া যেমন সম্মানিত তেমনি সুখী হইলাম। পুস্তকের প্রথম পংক্তি হইতে শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। না পড়িয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়া পড়িয়াছি। গ্রন্থে এতই আকৃষ্ট হইয়াছি।

গ্রন্থের আলোচিত বিষয় অতি উচ্চ ও প্রয়োজনীয়। আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে এখন যেরূপ অলস, অসমর্থ, উদাসীন, নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে আমাদের এই গ্রন্থলিখিত উপদেশের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ উপদেশানুসারে কার্য্য করা ভিন্ন আমাদের আর কিছুতেই শ্রেয়ঃ নাই, এবং মৎপ্রণীত "বেতালে বহুরহস্য" নামক পুস্তিকায় বর্ণিত আমাদের জাতির শোচনীয় অবস্থার সংস্কার হইবে না। শশীবাবুর গ্রন্থকে আমার উক্ত পুস্তিকার প্রবল পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করিলাম। গ্রন্থের লিখিত বিষয় যেমন উচ্চ ও গুরুতর, গ্রন্থকারের লিখিবার প্রণালীও তেমনি সহজ, সবল, ধীর, গম্ভীর, সংযত এবং চিন্তাশীলতা ও প্রগাঢ় বিশ্বাসীর গভীর বিশ্বাসের ব্যঞ্জক। গ্রন্থের কোন স্থানে একটু লঘুচিত্ততার নিদর্শন পাই না; কোন স্থানে একটু বাচালতা দেখি না; কোন স্থানে অসূয়া, অহমিকা বা অশিষ্টতার চিহ্নমাত্র নাই। ফলতঃ ভাষা, ভাব, ভঙ্গী, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, উপাদেয়তা, উপকারিতা— সমস্ত বিবেচনায় কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যায় সম্রান্ত

পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় যত আছে তদপেক্ষা বেশী থাকিলে বড় সুখের বিষয় হইত। যিনি কর্ম্মক্ষেত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার মাথা পাকা, হাত পাকা, বোধ হয় বয়সও পাকা।

আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন। কারণ ঐ মন্ত্রবিহনে কোন শিক্ষাই সফল হইবে না। শশীবাবুর গ্রন্থ সকলের দ্বারা এবং সমস্ত স্কুল কলেজে পঠিত হইবার উপায় কি?

Karmakshetra.—(by Babu Sasi Bhushan Sen, Published by the City Book Society, Calcutta, Price 1-4) This is a book not to be read merely, but to be studied. This does not arise from any ambiguity in style or confusion in the arrangement of materials but from the profound character of the work. It is a book of principles and author's position is sufficiently indicated by the title and the quotation from Carlyle with which the book begins 'Work is the mission of man on this Earth. A day is ever struggling forward, a day will arrive in some approximate degree when he who has no work to do, by whatever name he may be named, will not find it good to show himself in our quarter of the Solar System but may go and look out elsewhere if there be any idle planet discoverable." The author holds in common with most writers on Philosophy that given good health, work is happiness and he introduces the lives of great men like Raja Ram Mohan Ray, Sir, T. Madhav Rao, Sir, Salar Jung, to illustrate his principles. The style of the book is admirable, the arrangement of

matter is excellent, the expositions are lucid, and the arguments are convincing and skillfully put. **The study of such a work is an intellectual tonic.** The careful student is sure to find his mind quickened and stimulated by its perusal. The work should be adopted as a text book for those who take up Bengali as the second language in our University Examinations.—*Behar Herald.*

Healthy Literature.—There is need of healthy literature not only for the young but grown up men and women also. We would welcome literature which is calculated to instruct, enrich and purify the mind and to ennoble the soul. Babu Sashi Bhushan Sen's Karma Kshetra already noticed in these columns deserves to be placed in this category. It is a book the perusal of which can not fail to give both profit and pleasure. The gospel of work which it preaches with a wealth of illustrations and an elegance of language which reflect much credit upon the author, should be preached especially to our men of wealth and leisure.—*Bengalee.*

Karmakshetra.—This is a collection of four Essays in Bengali from the pen of Babu Sashi Bhushan Sen. They preach the gospel of work and teach the great lesson that life is real and earnest and should be devoted to work. It is precisely this kind of literature, that is wanted for the formation of the character of the rising hopes of the nation, and we have no hesitation in placing this book in the hands of every young man. The stimulating effect of the book of this kind it would be impossible to overestimate. * * * —*Bengalee.*

Karmakshetra.—This is the title of a treatise in Bengali, written, in the author's own words, to benefit the youthful generation of his country and we gladly and confidently record our unqualified opinion that both in design and execution it is eminently well calculated to fulfil this noble object. The cardinal tenet of the book seems to be that every one of us, whatever his abilities and whatever the circumstances he may be born in, can by a resolute exercise of **Willforce** so develop the forces and qualities that lie dormant in him as to be able to buffet successfully all the strokes of adversity and so in the long run to be the architect of his own fortune. He has analysed this process and separately dealt with the several stages underlying it. These are—firstly "Atmasakti Parichaya" or a consciousness of, and a firm belief in the existence of one's own power; secondly, "Sankalpa" or a noble determination to start with, and thirdly "Sadhana" or a steady application and a persevering energy in the field of action; and these are sure to lead him on to "Sidhi," or success;—the attainment of which he may not live to see but which is sure to come sooner or later. The utility and attractiveness of the volume have been considerably enhanced by a rich store of biographies and anecdotes—not of foreigners but of the greatmen of our own land who have risen to prominence in the various departments of life. The earnest stimulating and healthy tone pervading throughout the book as well as the felicity of diction and wealth of biographical illustration characterising it strongly remind us of Dr.

Smiles' admirable works in English. Like that distinguished writer, the author has preached with strenuous force his useful sermon as to the great possibilities that lie before those who bring force of will and steady perseverance to bear upon their life's task and the invaluable lessons he seeks to inculcate are enforced in the same effective way that is the special feature of Dr. Smiles' works, viz, by illustrations from the lives of greatmen. Another commendable feature of the book is—an under current of a genuine Hindu spirit running throughout—the author never missing an opportunity of pointing out how it is our religion that can best fit the mind for that training and schooling which he so zealously advocates. To the lovers of a pure and healthy literature, the invigorating and high-toned book will afford real and genuine employment. To young readers in particular, we earnestly recommend the perusal of this excellent treatise, which for solid usefulness may well be preferred to those lighter productions of the day with which to our great misfortune, our literature literally bristles. We need hardly add that such a book might, with advantage, be used as a text book for our schools.—*Amrita Bazar Patrika.*

কর্ম্মক্ষেত্র।—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যুবকগণের পাঠোপযোগী এইরূপ একখানি উপাদেয় পুস্তকের প্রচার হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই গ্রন্থে সিদ্ধার্থ, রাণাপ্রতাপ, চাণক্য, অজিত সিংহের দ্বাদশ মহিষী, রামমোহন রায়, ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি রামবর্ম্ম, রাজস্ব-তত্ত্বজ্ঞ স্যার টি মাধব রাও, স্যার সলরজঙ্গ, বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আহম্মদ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্যামাচরণ সরকার, স্যার মথুস্বামী, মাইকেল মধুসূদন, অক্ষয়কুমার, স্যার জেমসেট্‌জী, রামদুলাল সরকার প্রভৃতি স্বদেশের কর্ম্মবীরগণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, "সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে আশা, অধ্যবসায়, সাহস, নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সাধনা করিলে আমাদের যুবকগণ অনুরূপ সিদ্ধিলাভ করিবেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে বরণীয় হইবেন।" আত্মসংযমশিক্ষা ও চরিত্রগঠন-কার্য্যে এই পুস্তক হইতে যুবকগণ বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল, বর্ণনা সুখপাঠ্য ও ভাব হৃদয়ের উন্নতিসাধক। যুবকসমাজে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার না হইলে দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিব।—হিতবাদী।

কর্ম্মক্ষেত্র।—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত মূল্য ১৷০।—লেখক ইতিপূর্ব্বে কোন কোন নীতিগ্রন্থ প্রচার করিয়া সাহিত্যজগতে পরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে তাঁহার চিন্তাশক্তি ও লিপিনৈপুণ্যের অধিকতর প্রমাণ পাইয়া আমরা পরমানন্দিত হইতেছি। প্রত্যেক মানবের অন্তরে অমোঘ ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান আছে। কোনও মহৎ কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া সেই শক্তি অবলম্বনে সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। কেবল নীতি-বাদীর ন্যায় এই মহাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল দিয়া তাঁহার বচন সপ্রমাণ করিয়াছেন। * * *

লেখা অতি সরল বিশুদ্ধ ও সুযুক্তিপূর্ণ। এরূপ গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে বড়ই আবশ্যক এবং ইহা নরনারীর চরিত্রগঠনে সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।—বামাবোধিনী পত্রিকা।

কর্ম্মক্ষেত্র।—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত, কলিকাতা সিটিবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১।০ টাকা। গ্রন্থের লক্ষ্য সম্বন্ধে শশীবাবু লিখিয়াছেন।-"এই গ্রন্থে কর্ম্মের তিনটী অবস্থা দেখান হইয়াছে। প্রথম সঙ্কল্প, দ্বিতীয় সাধনা এবং তৃতীয় সিদ্ধি। যে সকল কর্ম্মবীরের আদর্শ এখানে সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা ভারতের শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত। তাঁহাদের বিশেষ পরিচয়, জন্মমৃত্যুর কাল, জন্মস্থান বা পিতৃমাতৃকুলের বিবরণ এখানে দেওয়া হয় নাই। সে সকল কথা তাঁহাদের জীবনীগ্রন্থে আছে। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্ম-সমূহের সঙ্কল্প কিরূপ অবস্থার মধ্যে করা হইয়াছিল, কি প্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সেগুলির সাধনা হইয়াছিল এবং শেষে সেগুলি সিদ্ধ হইয়াছিল কি না, কর্ম্মক্ষেত্রে এই সকল কথা প্রধানতঃ বলা হইয়াছে। আশা করা যায়, স্বদেশীয় যুবকগণ কার্য্যকালে কর্ম্মক্ষত্রের বিভিন্ন বিভাগে এই সকল পুণ্যপ্রসঙ্গ পাঠে সৎকর্ম্মের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইবেন। আশা, অধ্যবসায়, সাহস, নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সাধনায় রত থাকিবেন এবং শেষে ভগবানের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করিবেন।"

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ স্মাইল্‌স্ ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়াছেন। শশীবাবুর গ্রন্থেও বাঙ্গালীর কল্যাণ হইবে। গ্রন্থের রচনা প্রাঞ্জল, প্রাণস্পর্শী ও উদ্দীপনা-পূর্ণ। গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিবার জন্য রাজা প্রতাপ সিংহ, চাণক্য, সিদ্ধার্থ, রাজা রামমোহন রায়, মহারাজ রামবর্ম্ম, স্যার মাধব রাও, স্যার সালার জঙ্গ, বিদ্যাসাগর, সৈয়দ আহম্মদ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্যামাচরণ সরকার, স্যার মথুস্বামী, মধুসূদনদত্ত, অক্ষয়

কুমার দত্ত, সার জেমসেট্‌জী, রামদুলাল সরকারের জীবনের অদ্ভুত ঘটনা সকল সুকৌশলে যথা স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কর্ম্মবীর হইবার জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। কোন গ্রন্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা প্রশংসার বিষয় আর হইতে পারে না।—সঞ্জীবনী।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—কর্ম্মক্ষেত্র খানি পাঠ করিয়া আমি বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমাদের বাঙ্গালীচরিত্রে একটি সদ্‌গুণের বড় অভাব, তাহা পুরুষোচিত সাহস ও কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়তা। গ্রন্থকার সে অভাব পূরণ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এ গ্রন্থ খানি ঘরে ঘরে যুবকগণের হস্তে থাকিবার উপযুক্ত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্মান। আমরা অবগত হইলাম, বাবু শশিভূষণ সেন "কর্ম্মক্ষেত্র" নামক যে উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন, বোম্বাইয়ের এস্‌প্লেনেড হাইস্কুলের সংস্কৃত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নাথজী মোহনজী শাস্ত্রী ব্যাস বি, এ, গুজরাটী ভাষায় তাহার অনুবাদ করিতেছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। (সঞ্জীবনী)

Karmakshetra,—We are glad to note that Babu Sashi Bhushan Sen's well known work in Bengali named Karmakshetra is being translated into Guzrati with the author's permission. The book consists of four parts viz, (*a*) Saktiparichaya or consciousness of and firm belief in the existence of will power in man. (*b*) Sankalpa, or noble and high determination. (*c*) Sadhana or steady application and Siddhi or success and each of the parts is

well illustrated by short biographical sketch of Hindu, Mahomedan, Christian and other celebrities. It is just the kind of book that ought to be placed in the hands of the rising generation being healthy wholesome and inspiring in its influence upon the reader. We think the Government would do well to assist in the dissemination of literature of this kind.—*The Bengalee.*

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের প্রসঙ্গ-

সম্বলিত আদর্শ-শিক্ষার সহায়,

বঙ্গভাষার অভিনব

পুস্তক

হিতকথা।

শ্রীশশিভুষণ সেন-প্রণীত

মূল্য ॥০ আট আনা।

[পুস্তকের সমালোচনা পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

OPINIONS.

The Observer of the 23rd September 1896, says :—

Mr. Sasbi Bhushan Sen deserves the gratitude of the

Hitakatha Review. Young Bengal for his treatise on Education. Good paper, good printing and the best intentions are in themselves inviting enough to go through the book. Mr. Sen's language in general is simple smooth and flowing. In practical suggestions he seems to be in his element. He has wonderfully utilised the modern tendency of falling back to the old and his consistent suggestions of the introduction of old institution from play ground to academy ought to be a matter of serious speculation to our leaders in that sphere. The best of the book lies in its recognising the diseases of the time—diseases that are undermining the constitution of the rising generation of the country. The prescription of the author for them has some thing new and worthy of notice. True patriotic outbursts give a very fine colour to the book.

But with all these, the book is not without its blemishes. Mr. Sen has, like Herbert Spencer, committed one serious mistake of omission in his treatise. Æsthetic training is one of the most essential of all trainings for a harmonious development. * * * * We hope Mr. Sen will take up the subject in the next edition and make an attempt to make the 2nd chapter expurged of philosophic squilbble and say his say in simple practicable way in which has shown so much aptitude. It will be more welcome to those for whom the book is intended.

With these additions and alterations the book deserves to be translated in all the vernaculars of India.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষক সুপ্রসিদ্ধ শ্রদ্ধেয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন:—

আমি "হিতকথা" গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি। ইহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ইহাতে অভিব্যক্ত উপদেশ গুলিও তেমনি উপাদেয়। এদেশীয় যুবকগণকে এরূপ হিতকথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা দেশের প্রকৃত বন্ধু। যুবকগণ আরও এরূপ হিতকথা বহুল পরিমাণে শুনিতে পায় ইহা প্রার্থনীয়। বিশেষতঃ শশীবাবু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার যেরূপ একত্র সমাবেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাহা বর্ত্তমান সময়ের গ্রন্থকারগণের অনুকরণযোগ্য।—

HOPE of the 27 July 1896 contains the following review :—

Hitakatha, by Babu Sasi Bhushan Sen is a neatly printed reading book in Bengali intended for the upper forms in our schools. *It is prepared on a new plan* and we believe will serve as a very good treatise on Education for young boys. It appears that in 1888 the author obtained permission from the late Professor Blackie to translate his invaluable book on Self-Culture into Bengali and he also had some correspondence with Mr. Herbert Spencer about translating that philosopher's work on Education. While engaged on these translations the

author found that the requirements of our boys could not be properly met by literal translations of the said works and he proceeded on to compose an original treatise for inculcating into young minds the true principles of education according to the best European as well as Oriental standards. This plan of the book has been executed very carefully and both its style and contents make it *excellently suitable for Bengali school boys. We hope to see it adopted as a text book in all our schools.*

১৩০৩ শ্রাবণ সংখ্যা নব্যভারতে নিম্নলিখিত সমালোচনা প্রকাশিত হয় ঃ—

হিতকথা।—শ্রীশশিভূষণ সেন-প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থকার নিবেদনে লিখিয়াছেন ঃ—

—"জগতের সাধু ও সুধীসমাজ মানব-সমাজের হিতোদ্দেশে যে সকল কল্যাণ-কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন এ পুস্তিকায় তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র শুনাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।" গ্রন্থকার মৌলিকতার কিছুই ভাণ করেন নাই; স্পেন্‌সার্‌ ব্ল্যাকি প্রভৃতি মহাত্মাগণের কথা অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। সার সত্য কথার আলোচনা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক কল্যাণের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে মানুষ কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, এ পুস্তকখানি তাহার সুন্দর উপদেশে পূর্ণ। এই একখানি পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেকের অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে। শশিবাবুর ভাষার সামান্য সামান্য ত্রুটী থাকিলেও

মোটের উপর ভাষা প্রাঞ্জল, মধুর এবং সংযত। শশিবাবু যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকখানি স্কুলপাঠ্যলিষ্টভুক্ত হইলে. আমরা যারপর নাই সুখী হইব।

Mr. R. C. Dutt, C. I. E. Commissioner, Orissa Division, and the well known author of the History of the Literature of Bengal says :—

* * I have no doubt you have placed an excellent object before you. Your style is simple but the ideas are sometime too deep for boys.

বঙ্গবাসী কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসু এম্, এ, মহোদয় হিতকথা সম্বন্ধে বলেন :—

"মহাশয় আপনার হিতকথা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। স্কুলপাঠ্য অনেক পুস্তকই আমাকে পড়িতে হয়। কিন্তু এরূপ ধরণের পুস্তক পূর্ব্বে আর পড়িয়াছি এমন মনে হয় না। ইহা ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী। অবসর পাইলে বঙ্গবাসী স্কুলে ইহা চালাইতে চেষ্টা করিব ইতি।

The Honorary Secretary to the Chaitanya Library certifies the book thus :—

I have carefully gone through Babu Sasi Bhusan Sen's admirable work named **Hitakatha.** The Chaitanya Library possesses over *seventeen hundred volumes of Bengali books, and the aforesaid book is by far the best of its kind we have.* I must unhesitatingly

say that no school boy or circulating Library in Bengal should be without a copy of that book.

মালদহ মডেল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সেন-প্রণীত হিতকথা। এই গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ, বঙ্গভাষায় এই নূতন দেখিলাম। ভাষা প্রাঞ্জল, অথচ ওজোগুণপূর্ণ। গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষার সামান্য ত্রুটি আছে, গ্রন্থকার সে গুলির সংশোধন করিলে গ্রন্থ খানি অনবদ্য হইবে। গ্রন্থকার ক্ষমতাশালী। স্পেন্সার কৃত এডুকেশন গ্রন্থ খানির অনুবাদ করেন নাই কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হিতকথা বালকদের পক্ষে উপাদেয় পাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। ভরসা করি, বালকদের পিতৃগণের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গ-ভাষার শোভা ও সামর্থ্য বাড়াইবেন।

Babu Umesh Chandra Dutt B. A. Principal City College, Fellow of the Calcutta University says :—

I have been very much pleased to go through the **Hitakatha** or "good words" and *can recommend it as a good text book in Bengali for higher class students in the Vernacular Schools and middle class students in the English High Schools.* It discusses intelligently the best ways for a thorough and sound education which consists in the improvement of the body, the mind and the soul. The author's views are enlightened and at the same time moderate. His language is chaste and he has made the subject interesting by the introduction of beautiful anecdotes. The author is deserving of encouragement.

সহজ বোধ বিকাশ।

শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত

মূল্য /০ এক আনা।

বালকবালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই পুস্তক নবপদ্ধতি অনুসারে রচিত হইয়াছে, চক্ষু ও অঙ্গুলির যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বর্ণমালার গঠন প্রণালী নির্দ্দেশ, সরস, সহজ বোধ্য ও সুপরিচিত শব্দ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে বাস্তব উদাহরণ দ্বারা শব্দার্থ বুঝাইবার চেষ্টার জন্য পুস্তকখানি শিশুগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

সিটী বুক সোসাইটী, নাথ এণ্ড কোং প্রভৃতি
বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।